মৌলবাদী অপপ্রচার

প্রকৃত সত্য

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

প্রকাশ : ২৫শে এপ্রিল, ২০১৭

প্রকাশক :
চণ্ডী চক্রবর্তী
মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ ভবন
৩১, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

মুদ্রক :
জয়ন্ত শীল
গণশক্তি প্রিন্টার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৩৩, আলিমুদ্দিন স্ট্রিট
কলকাতা-৭০০ ০১৬

দাম : ৫ টাকা

মৌলবাদী অপপ্রচার

‘ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবে’

প্রকৃত সত্য

মুসলিম জনসংখ্যার প্রসঙ্গ তুলে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো সঙ্ঘ পরিবারের পুরানো অভ্যাস। তারা বলে, ২০৩৫ সালেই নাকি মুসলিমরা ভারতে জনসংখ্যার দিক থেকে হিন্দুদের ছাপিয়ে যাবে; ২০৫০ সালে নাকি ভারতে মুসলিম জনসংখ্যায় ইন্দোনেশিয়ার চেয়ে বেশি হয়ে যাবে; মুসলিম জনসংখ্যার বিচারে ভারত বিশ্বে এক নম্বর স্থানে চলে আসবে। বিজেপি নেতা যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, ‘মুসলমানদের সংখ্যা যেভাবে বাড়ছে তা উদ্বেগজনক। ওদের জনসংখ্যায় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে কেন্দ্রকে ব্যবস্থা নিতে হবে।’ যোগীর নেতা স্বয়ং নরেন্দ্র মোদী গুজরাটের রিলিফ ক্যাম্পগুলিকে ‘সন্তান উৎপাদনের আখড়া’ বলেছিলেন।

বলাবাহুল্য সঙ্ঘ পরিবার এসব ক্ষেত্রে তথ্য ও যুক্তির ধার ধারে না। সম্প্রতি জনগণনার (২০০১-২০১১)ধর্মভিত্তিক হিসেব প্রকাশ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। ২০০১-২০১১ পর্বে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১৭.৭ শতাংশ। হিন্দু জনসংখ্যা বেড়েছে ১৬.৮ শতাংশ। মুসলমান জনসংখ্যা ২৪.৬ শতাংশ। খ্রিস্টান জনসংখ্যা ১৫.৫ শতাংশ।

জনগণনার সরকারি হিসেব বলছে, ভারতে সমস্ত ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষেত্রেই বৃদ্ধির হার ক্রমাগত কমেছে। মুসলমান জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দশকের বিচারে বৃদ্ধি- হার অনেক দ্রুত কমেছে। হিন্দু জনসংখ্যার তুলনায় বেশি হারে কমেছে। বস্তুতপক্ষে, ২০০১-২০১১ সময়পর্বে ভারতে মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার এত কম যা স্বাধীনতা-উত্তরপর্বে রেকর্ড। নিচের সারণি দেখলে সেটা পরিষ্কার হবে।

সম্প্রদায়	১৯৯১	২০০১	২০১১
হিন্দু	২৫.১%	২০.৩%	১৬.৮%
মুসলমান	৩৪.১%	২৯.৫%	২৪.৬%

জনসংখ্যা বৃদ্ধি হবে কিনা তা নির্ভর করে সন্তান জন্মদানের হারের কমা বাড়ার উপর।

মুসলিম বিবাহিত মহিলাদের সন্তান জন্মদানের হার ২০০১ সালে ছিল ৪.১। ২০১০-এ ৩.২ এবং ২০৫০-এ হতে পারে ২.১। হিন্দু বিবাহিত মহিলাদের ক্ষেত্রে ২.৫ থেকে ২০৫০ সালে ১.৯ হতে পারে। সংখ্যা দু'টি প্রায় কাছাকাছি এসে যাবে। এক্ষেত্রে হিন্দু জনসংখ্যাকে ছাপিয়ে যাওয়ার তত্ত্ব অলীক কল্পনা।

সঙ্ঘ পরিবার জনসংখ্যা কমা/বাড়া সম্পর্কে এমনভাবে বলে যাতে মনে হতে পারে এক্ষেত্রে ধর্মই যেন কারণ। বাস্তবে জনসংখ্যা কমবে না বাড়বে তা ধর্মীয় পরিচয়, গায়ের রঙ এবং বাসস্থান ইত্যাদির ওপর নির্ভর করে না। নির্ভর করে, সামাজিক সুযোগ প্রাপ্তি, আর্থিক অবস্থা, ক্ষমতায়ন, শিক্ষা, মহিলাদের সামাজিক অবস্থান ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর। সেদিক থেকে ভারতের মুসলিমরা উন্নয়নের নানা সূচকে পিছিয়ে আছে।

সঙ্ঘ পরিবার মুসলিম জনসংখ্যা নিয়ে লাগাতার সরব হলেও মুসলিম সম্প্রদায়ের সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে পরিকল্পিতভাবে নীরব থাকে। প্রকৃত তথ্য হলো, এদেশে ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলির মধ্যে আর্থিকভাবে সবচেয়ে পিছিয়ে মুসলিমরাই। জাতীয় নমুনা সমীক্ষার ২০০৯-১০ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী, দৈনিক মাথা পিছু খরচের সামর্থ্য মুসলিমদের ক্ষেত্রে ৩২.৬৬ টাকা, হিন্দুদের ক্ষেত্রে ৩৭.৫০ টাকা, খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে ৫১.৪৩ টাকা, শিখদের ক্ষেত্রে ৫৫.৩০ টাকা।

শিক্ষার দিক থেকেও অন্যান্যদের চেয়ে মুসলিমরা পিছিয়ে। ২০১১ সালের জনগণনার প্রতিবেদন অনুযায়ী, মুসলিমদের প্রায় ৪৩ শতাংশই নিরক্ষর। হিন্দুদের ৩৬.৪ নিরক্ষর। মুসলিমদের মধ্যে মাত্র ২.৭৬ শতাংশ স্নাতক বা তার বেশি শিক্ষালাভ করেছেন। ২০১৪-১৫ সালের অল ইন্ডিয়া সার্ভে অন হায়ার এডুকেশন অনুযায়ী, মুসলিমদের মাত্র ৪.৪ শতাংশ উচ্চশিক্ষার সুযোগ পায়।

সাচার কমিটির প্রতিবেদনেও দেখানো হয়েছিল, সরকারি চাকরিতে, বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানে, রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থায়, বি এস এফ, মিলিটারিতে মুসলিমদের চাকরি ২-৩ শতাংশ মাত্র। তাছাড়া, বাসন, কার্পেট, সূচিশিল্প ইত্যাদির মতো যেসব ঐতিহ্যশালী শিল্পে মুসলিম সম্প্রদায়ের বিরাট অংশ বংশপরম্পরায় যুক্ত সেখানেও বিশ্বায়নের চাপে কর্মচ্যুতির হার প্রবল। এসব নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার নীরব। অবশ্য, আর্থিক ও সামাজিকভাবে পিছিয়ে থাকা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের নিয়েও সঙ্ঘ পরিবারের মাথাব্যাথা নেই।

মৌলবাদী অপপ্রচার

'তিন তালাক প্রথা দূর করতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি দরকার।'

প্রকৃত সত্য

ধর্মাচরণ নির্বিশেষে যেকোনো প্রগতিমনস্ক মানুষ তাৎক্ষণিক ও একতরফা তিন তালাকের মতো নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক প্রথার বিরুদ্ধে। দীর্ঘদিন ধরে মুসলিম মহিলাদের আন্দোলন এই ধরনের প্রথাকে 'ইসলামবিরোধী' হিসেবে চিহ্নিত করে তা বিলোপের দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের দাবির প্রতি মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে নারী

পুরুষ উভয়েরই উল্লেখযোগ্য সমর্থন রয়েছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেও আলে হাদিস ও শিয়াদের মতো জনগোষ্ঠী রয়েছে যারা তাৎক্ষণিক একতরফা তিন তালাককে মান্যতা দেয় না। ইসলাম যেখানে রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে স্বীকৃত এমন অনেক মুসলিম দেশেও তাৎক্ষণিক ও একতরফা তিন তালাক প্রথা এখন অচল।

'অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড'-এর মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বঘোষিত প্রতিনিধিরা মুসলিম পার্সোনাল ল সংস্কারের দাবিকে উপেক্ষা করেছে। মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থেই তাদের এই অবস্থান বদল করা উচিত। ধর্মীয় বিশ্বাসের নামে সমাজে পুরুষের আধিপত্য এবং নারীর প্রতি বৈষম্য বহাল রাখার চেষ্টা কোনো মতেই মেনে নেওয়া যায় না। বস্তুতপক্ষে, ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়েও এর অনেক বেশি সম্পর্ক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার সঙ্গে। সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির উচিত দৃঢ়তার সঙ্গে এই প্রথার অবসানের দাবিকে সমর্থন করা।

তবে তিন তালাক নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার বা তার নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের তৎপরতার পিছনে আর যাই হোক নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার কোনো উদ্দেশ্য নেই। হিন্দুত্ববাদীরা নিজে সমাজে নারীর ভূমিকা সম্পর্কে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণায় বিশ্বাসী। এই হিন্দুত্ববাদীরাই 'সতী-প্রথা'র পক্ষে মিছিল করে। খাপ পঞ্চায়েতকে তারা সমর্থন করে। মহিলা সংরক্ষণ বিল নিয়েও বিজেপি সরকার চুপচাপ। মনে রাখতে হবে, সঙ্ঘ পরিবারের নেতারা এক সময় সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দু আইন সংস্কারের বিরোধিতা করেছিলেন। 'মনুবাদ' সঙ্ঘ পরিবারের দর্শন, যা নারীর কোনো স্বাধীন ভূমিকাই স্বীকার করে না। 'লাভ জিহাদ'-এর বিরোধিতার নাম করে নারীর নিজস্বপছন্দ মতো বিবাহের অধিকারকে সঙ্ঘ পরিবার কীভাবে নস্যাৎ করতে চাইছে তাও দেশবাসী দেখছেন। এহেন হিন্দুত্ববাদীরা হঠাৎ করে মুসলিম মহিলাদের দুরবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছে কেন ? সঙ্ঘ পরিবার আসলে তিন তালাক বিরোধিতার নামে তাদের মুসলিমবিরোধী সাম্প্রদায়িক কর্মসূচীকেই তুলে ধরতে চায়।

তিন তালাক তুলে দেওয়ার দাবির সঙ্গে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার দাবিকে সঙ্ঘ পরিবার জুড়ে দিয়েছে উদ্দেশ্যমূলকভাবেই। যেন তিন তালাকের মতো মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত প্রথাগুলিই শুধুমাত্র নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক, আর কোনো সম্প্রদায়ের মধ্যে নারীর প্রতি বৈষম্য নেই এবং অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করে দিলেই দেশ থেকে লিঙ্গবৈষম্য অন্তর্হিত হবে।

হিন্দু ব্যক্তিগত আইনেও উত্তরাধিকার প্রশ্নে, অভিভাবকত্ব ও দত্তক নেবার প্রশ্নে মহিলাদের প্রতি বৈষম্যমূলক ধারা রয়ে গেছে। হিন্দু বিবাহ আইনে শিশু বিবাহ নিষিদ্ধ হলেও তা পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। আসল কথা হলো, শুধু মুসলিম ব্যক্তিগত আইনের নয়, সব ব্যক্তিগত আইনেরই সংস্কার দরকার। স্বভাবতই নারী-পুরুষ সমতা নয়, সঙ্ঘ পরিবার চায় সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ তীব্রতর করতে।

‘মুসলিমদের মধ্যে বহুবিবাহ প্রথার কারণেই জনসংখ্যা বাড়ছে।’

প্রকৃত সত্য

মুসলিম জনসংখ্যা প্রসঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে বহুবিবাহের স্বীকৃতির প্রসঙ্গটি উত্থাপন করে থাকে উদ্দেশ্যমূলকভাবে। কোনো সন্দেহ নেই, যে সম্প্রদায়ই হোক না কেন, বহুবিবাহের মতো প্রথা অমানবিক এবং তা পরিত্যক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিষয়টি বিচার করলে সমস্যা বাড়ে।

সামাজিক প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বহুবিবাহ প্রথার স্বীকৃতি কমেছে। এমনকি অনেক ইসলামিক রাষ্ট্রেও এখন বহুবিবাহের বিপক্ষে শক্তিশালী জনমত গড়ে উঠেছে। বহু দেশে আইন অনুযায়ী একাধিক বিবাহ করা খুব সহজ নয়। নানা শর্ত রয়েছে। সেসব শর্ত সমতাভিত্তিক বা যুক্তিসম্মত তা নয়, কিন্তু এথেকে অন্তত বোঝা যায় যে, বহুবিবাহ প্রথা সম্পর্কে সমাজে প্রশ্ন উঠেছে। ‘তিন তালাক’-র মতো এক্ষেত্রেও ধর্মীয় বিশ্বাসের চেয়েও বহুবিবাহ প্রথার বেশি সম্পর্ক পুরুষতান্ত্রিক মানসিকতার সঙ্গে। একাধিক বিবাহের অধিকার পুরুষেরই। মহিলার নয়।

তবে মুসলিম ব্যক্তিগত আইনে একজন পুরুষের একই সঙ্গে চারজন স্ত্রী থাকার বিধি থাকলেও বাস্তবে তা সর্বদা ঘটে না। নারী-পুরুষ সংখ্যার হিসেবেই তা সম্ভব নয়। ২০১১ সালের জনগণনার তথ্য অনুযায়ী, ভারতে মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রতি হাজার জন পুরুষ পিছু রয়েছে ৯৫১ জন মহিলা। ফলে একাধিক বিবাহের সুযোগ আছে বলেই সব মুসলিম পুরুষের চারজন নারীর সঙ্গে বিবাহ হবে এবং মুসলিম জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবে বেশি হারে–তথ্য এবং যুক্তি তা বলে না।

আমাদের দেশে বহুবিবাহের সমস্যা শুধুমাত্র মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যেই একান্তভাবে সীমাবদ্ধ নয়। ন্যাশনাল ফ্যামিলি হেল্থ সার্ভের (২০০৬) রিপোর্ট অনুযায়ী, ১৯৬১ সালে শতকরা ৫.৮ ভাগ হিন্দু পরিবারেও বহুবিবাহের চল ছিল। ১৯৬১সালে মুসলিমদের মধ্যে বহুবিবাহের চল ছিল শতকরা ৫.৭ ভাগ পরিবারে। ২০০৬ সালের হিসেবেও শতকরা ১.৭ হিন্দু পরিবারে বহুবিবাহ হয়েছে; যদিও তা বেআইনি। বহুবিবাহ হয়েছে শতকরা ৩.৪ ভাগ বৌদ্ধপরিবারেও। মুসলিমদের মধ্যে একাধিক বিবাহ হয়েছে শতকরা ২.৫ ভাগ পরিবারে। তবে তথ্য অনুযায়ী, সব সম্প্রদায়ের মধ্যেই যত দিন যাচ্ছে ততই বহুবিবাহের চল কমছে। শিক্ষা সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সামাজিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানসিকতাতেও পরিবর্তন এসেছে।

বহুবিবাহের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তুলতে সর্বস্তরের মানুষের উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। তবে সঙ্ঘ পরিবারের উদ্দেশ্য ভিন্ন। সঙ্ঘ পরিবার চায় বহুবিবাহের সমস্যাটিকে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবহার করতে। এর ফলে সমস্যা কমা তো দূরের কথা, বাড়বে।

মৌলবাদী অপপ্রচার

'গো-হত্যা এবং গোমাংস ভক্ষণ অপরাধ।'

প্রকৃত সত্য

আমাদের দেশ ছাড়াও দুনিয়ার প্রায় সব প্রান্তেই এবং মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তসহ নানা ধর্মের মানুষের খাদ্য তালিকায় গোমাংস স্থান পেয়েছে। তুলনামূলকভাবে সস্তায় উপকারী খাদ্য হিসেবেও গোমাংসের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। কেউ কি মানুষের স্বাধীন ও স্বীকৃত খাদ্যাভাসের অধিকার কেড়ে নিতে পারে? স্বয়ং গান্ধিজী গো-হত্যা বন্ধের নির্দেশ দিতে রাজি ছিলেন না। ১৯৪৭ সালের ২৫ জুলাই প্রার্থনাকালীন আলোচনায় গান্ধিজী বলেছিলেন: "How can I force anyone not to slaughter cows unless he is himself so disposed? It is not as if there were only Hindus in the Indian Union. There are Muslims, Parsis, Christians and other religious groups here."।

অথচ, সঙ্ঘ পরিবার 'গো-হত্যা' এবং গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে আগ্রাসী অভিযানে নেমেছে। কত জরুরি বিষয় ছেড়ে গোমাংস ভক্ষণ নিয়ে তাদের যত মাথাব্যথা। মানবোন্নয়ন সূচকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান ১৩১ তম। এক লাখ থেকে একলাখ তিরিশ হাজার মানুষ প্রতি বছর কলেরায় প্রাণ হারান। প্রতিবছর সাপের কামড়ে মারা যান প্রায় ৪৬ হাজার মানুষ। হিন্দুত্ববাদীরা এসব নিয়ে উদ্বিগ্ন নয়!

প্রথমত, সঙ্ঘ পরিবার এমনভাবে প্রচার করে যেন এদেশে মুসলিমরাই শুধু গোমাংস খান। সরকারি তথ্য জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (২০১১-১২) বলছে, ভারতে গোমাংস ভক্ষণকারীদের মধ্যে কমবেশি প্রায় সব ধর্মাবলম্বী মানুষই রয়েছেন। খ্রিস্টানদের মধ্যে ২৬.৫১ শতাংশ, বৌদ্ধদের মধ্যে ৯.৩১ শতাংশ মানুষ। এমনকি হিন্দুদের মধ্যেও ১.৩৯ শতাংশ মানুষ গোমাংস খান। মুসলিমদের মধ্যে গোমাংস খান ৪১.৯৭শতাংশ।দেখা যাচ্ছে, এমনকি মুসলিমদের বেশিরভাগই গোমাংস খান না।

বাস্তবে, কোনো ধর্মেই গোমাংস ভক্ষণে বাধা নেই। হিন্দু ধর্মেও নেই। বৈদিক সাহিত্যের গবেষকরা দেখিয়েছেন, বৈদিক যুগে গোমাংস খাওয়ার প্রচলন ছিলো। ঋগ্বেদ থেকে বৈদিক যুগের শেষ পর্বের উপনিষদেও গোমাংস খাওয়ার প্রমাণ আছে। বিষ্ণুপুরাণ, বশিষ্ঠ স্মৃতি, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, রামায়ণ, মহাভারত বিশ্লেষণ করে বিশেষজ্ঞরা দেখিয়েছেন হিন্দুধর্মে গোরু বলি দেওয়া বা গোরুর মাংস খাওয়ার চল ছিল।

তৈত্তরীয় ব্রাহ্মণে বিষ্ণু, ইন্দ্র, রুদ্র এবং সূর্যকে পৃথক পৃথকভাবে বিভিন্ন ধরনের ষাঁড় ও গাভী উৎসর্গ করা হয়েছে। সূত্র, কল্পসূত্র, গার্হস্থসূত্রে গোমাংসকে বিভিন্ন পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠানে খাদ্য হিসাবে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। অশ্বমেধ এবং গোমেধ যজ্ঞ করা হতো নিশ্চয়ই শুধু বলি এবং নৈবদ্য নিবেদনের জন্য নয় – 'প্রসাদ' পাবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষাও ছিল।

তাছাড়া, আর এস এস-র প্রচারের আড়ালে মোদী সরকারের জমানায় ২০১৫ ও

২০১৬ সালে বিফ রপ্তানিতে ব্রাজিলের সঙ্গে বিশ্বে একনম্বর স্থান অধিকার করেছে ভারত। মার্কিন সরকারের কৃষিদপ্তরের হিসেব অনুযায়ী, ২০১৫-১৬ সালে ভারত বিফ রপ্তানি মারফত আয় করেছে ২৬,৬৮২ কোটি টাকা।

মৌলবাদী অপপ্রচার

‘জম্মু-কাশ্মীরের জন্য সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা বৈষম্যমূলক।’

প্রকৃত সত্য

স্বাধীনতার পর জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির সমস্ত ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট উপেক্ষা করে সঙ্ঘ পরিবার সংবিধানের ৩৭০নং ধারা সম্পর্কে খড়্গহস্ত। সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা ভারতীয় রাষ্ট্রের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের একমাত্র যোগসূত্রই। জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসনের সাংবিধানিক রক্ষাকবচ। ৩৭০নং ধারা একতরফা খারিজের দাবি তোলার অর্থ ভারত রাষ্ট্রের সঙ্গে জম্মু-কাশ্মীরের যোগসূত্রটিকেই অস্বীকার করা।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ক্ষমতা হস্তান্তরের সময় স্বাধীনতার সময় ভারত না পাকিস্তান কোন দেশের সঙ্গে মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জম্মু-কাশ্মীর যুক্ত হবে, সেই প্রশ্নে হিন্দু রাজা হরি সিং ছিলেন ‘স্বাধীন’ জম্মু-কাশ্মীরের পক্ষে। পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে হরি সিং ভারত সরকারের হস্তক্ষেপ চান এবং জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সায় দেন। ১৯৪৭ সালের ২৬শে অক্টোবর এই মর্মে রাজা হরি সিং-র সঙ্গে ভারত সরকারের চুক্তি হয়। যে যে শর্তে সেই চুক্তি হয় সেগুলিকে মান্যতা দিতেই ৩৭০ নং ধারা সংবিধানে সংযোজিত হয়। কাশ্মীরের বিশেষ পরিস্থিতি মাথায় রেখে তৎকালীন গণপরিষদে অনেক আলোচনার পরই তা চূড়ান্ত হয়। সর্বোপরি ৩৭০ নং ধারা অনুযায়ীই সংবিধান থেকে এই ধারা খারিজ করা বর্তমান অবস্থায় সম্ভব নয়, উচিতও নয়।

হরি সিং-র দোদুল্যমানতার সময় ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা শেখ আবদুল্লা কিন্তু জম্মু-কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পক্ষে ছিলেন দৃঢ়ভাবে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী জম্মু-কাশ্মীরের ৬৮.৩১ শতাংশ মানুষই মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৯৪৭ সালে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষের অনুপাত সে রাজ্যে আরও বেশি ছিল। জম্মু-কাশ্মীরের বিপুল সংখ্যক মুসলিম ধর্মাবলম্বী মানুষ পাকিস্তান নয়, ভারতের সঙ্গেই থাকার পক্ষে ছিলেন। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যেপূরণে সঙ্ঘ পরিবার এইসব ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চাইছে।

সঙ্ঘ পরিবার কেন ৩৭০ নং ধারা বাতিল করতে চায়? সঙ্ঘ পরিবার আসলে মধ্যযুগীয় ধর্মভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনে বিশ্বাসী। তাদের মূল লক্ষ্য, দেশের বর্তমান সংবিধান পালটে ভারতকে ‘হিন্দু রাষ্ট্রে’ পরিণত করা। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্য জম্মু-কাশ্মীর সম্পর্কে গোড়া থেকেই তারা বিদ্বেষমূলক মনোভাব পোষণ করে। সঙ্ঘ পরিবার রাজনৈতিক অবস্থানের দিক থেকে দক্ষিণপন্থী এবং স্বৈরতান্ত্রিক। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও

সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ-গণতান্ত্রিক মর্মবস্তুর প্রতিটি বিষয়েরই তারা সাধারণভাবে বিরোধী। বিরোধী যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোরও।

ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ নং ধারা নজিরবিহীন কোনো ব্যবস্থা নয়। পৃথিবীর বহু দেশে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে অঙ্গরাজ্যগুলির সম্পর্ক একধরনের নয়। বিভিন্ন ধরনের। আমাদের দেশেও সংবিধানে বিশেষ ধারা শুধুমাত্র জম্মু-কাশ্মীরের জন্যেই নেই; একেবারে জম্মু-কাশ্মীরের মতো না হলেও হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির কয়েকটি রাজ্যের জন্যও সংবিধানে বিশেষ ধারা রয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এমনিতে সংবিধানে ৩৭০ নং ধারা বজায় থাকলেও স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে নানাভাবে জম্মু-কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত বিশেষ অবস্থানকে লঘু করে দেওয়া হয়েছে। এসবের ফলে রাজ্যবাসী ক্ষুব্ধ হয়েছেন, গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলি দুর্বল হয়েছে। বর্তমান পরিস্থিতির পটভূমিতে জাতীয় ঐক্যের স্বার্থেই জম্মু-কাশ্মীরের জন্য ৩৭০নং ধারার মধ্যেই আরও স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন।

দুর্ভাগ্যজনক ভাবে ন্যাশনাল কনফারেন্স এবং পিপলস ডেমোক্র্যাটিক পার্টির মতো দলগুলি সাম্প্রতিক সময়ে রাজনৈতিক সুবিধাবাদের নজির সৃষ্টি করে। গণতান্ত্রিক স্বায়ত্তশাসন এবং ধর্মনিরপেক্ষতাই জম্মু-কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার প্রাথমিক পূর্বশর্ত। ৩৭০ নং ধারার বিরোধিতা করে সঙ্ঘ পরিবার আসলে দেশের স্বার্থবিরোধী কাজ করছে।

মৌলবাদী অপপ্রচার

‘হিন্দু মহাসভার নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনক।’

প্রকৃত সত্য

সঙ্ঘ পরিবারের দাবি, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি নাকি ‘পশ্চিমবঙ্গ’-এর ‘জনক’ এবং এভাবেই তিনি ‘হিন্দুপ্রধান’ পশ্চিমবঙ্গকে পাকিস্তানের আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা করেন। সংঘ পরিবার একদিকে ’অখন্ড ভারত’-র কথা বলে, অন্যদিকে বাংলা প্রদেশকে ‘খন্ড’ করার ‘কৃতিত্ব’ দাবি করে!

সঙ্ঘ পরিবার বলে, স্বাধীনতার আগে মুসলিম লিগ প্রধান মহম্মদ আলি জিন্না পাকিস্তানের অংশ হিসেবে গোটা বাংলাকে (বিশেষ করে কলকাতাকে) দাবি করেন। কমিউনিস্টরা এবং কংগ্রেস নাকি সেই দাবি প্রায় মেনেই নিয়েছিল। উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি কঠোর মেহনত করে বঙ্গীয় আইনসভাকে এমন করে প্রভাবিত করেন, যে তাঁরা নাকি পাকিস্তানের কবল থেকে ‘হিন্দুপ্রধান’ পশ্চিমবাংলাকে আলাদা করার সিদ্ধান্ত নেয়; এরফলে কলকাতাসহ পশ্চিমবঙ্গ নাকি পাকিস্তানের (পড়ুন ইসলামী) আগ্রাসী থাবা থেকে রক্ষা পায়।

বলাবাহুল্য, সঙ্ঘ পরিবারের এই বক্তব্য ভিত্তিহীন, অতিরঞ্জিত এবং ইতিহাসের অপব্যাখ্যায় ভরা। ঘটনার গতিপ্রকৃতি ছিল অন্যরকম।

দেশভাগ এখন এক ঐতিহাসিক সত্য। কিন্তু দেশভাগ ও বাংলাভাগ স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য ছিল না। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক স্বাধীন সাধারণতন্ত্র হিসেবে ঔপনিবেশিক-উত্তর ভারত গড়ে তোলা ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতীয় কংগ্রেসেরও ঘোষিত লক্ষ্য। দুর্ভাগ্যজনক যে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকে অবিভক্ত রেখে ঔপনিবেশিক শাসনমুক্তি সম্ভব হয়নি। ভারত ইতিহাসের তা এক বেদনাময় অধ্যায়। স্বয়ং গান্ধিজী দেশভাগের পক্ষে ছিলেন না। একমাত্র ধর্মীয় পরিচিতির উগ্রতা দিয়ে যারা চারপাশকে দেখেন, তাঁরাই পারেন দেশভাগ নিয়ে 'কৃতিত্ব' জাহির করতে।

ভারত ভাগের অংশ হিসাবেই দু'ভাগ হয়েছিল বাংলা। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তি ধর্মীয় পরিচিতির ভিত্তিতে ভারতের জনগণকে বিভাজিত করে। মুসলিম এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িক ও বিচ্ছিন্নতার শক্তি তাতেই মদত দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতৃত্বের একাংশ ক্রমে তার শিকার হন। তীব্র অনিচ্ছা ও বিরোধিতা সত্ত্বেও শেষ পর্বে দেশভাগকে মেনে নিতে বাধ্য হয় স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যান্য স্রোত।

১৯৪০-র দশকের মাঝামাঝি থেকে অবিভক্ত বাংলায় হিন্দু-মুসলিম উভয় সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমশ শক্তি বৃদ্ধি করে। বাংলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসারে তৎপর ভূমিকা পালন করে হিন্দু মহাসভা – যে সংগঠনের নেতা ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ।

তবে ১৯৪৬-র প্রাদেশিক নির্বাচনে হিন্দু আসনগুলিতে কংগ্রেস একচেটিয়া জয় পায়। চল্লিশের দশকের শেষভাগে বাংলা প্রদেশে কংগ্রেসের ভূমিকাই ছিলো মুখ্য। কংগ্রেসের সর্বভারতীয় নেতৃত্ব যত দেশভাগের প্রস্তাব মেনে নেবার দিকে গেছে, বাংলায় কংগ্রেসের দেশভাগ তথা বাংলাভাগের পক্ষে প্রচার তত তীব্র হয়েছে।

দেশ ভাগ তথা বাংলা ভাগ ১৯৪৬ সালের প্রথমদিকেও অনিবার্য মনে হয়নি। ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকার গঠিত ক্যাবিনেট মিশন ১৯৪৬ সালের ২৪ মার্চ ভারতে আসে। কমিশন ১৯৪৬ সালের ১৬ মে যে প্রস্তাব পেশ করে তাতে পৃথক পাকিস্তান গঠনের কথা ছিল না। তবে ক্যাবিনেট মিশন তাদের প্রস্তাবে প্রদেশগুলিকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতেই চিহ্নিত করেছিল। সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেট মিশন প্রস্তাবে কংগ্রেস রাজি হয়নি। মুসলিম লিগও পৃথক পাকিস্তানের দাবিতে অনড় ছিল। অচলাবস্থা তৈরি হয়। ১৯৪৬ সালেরই ১৬ জুন মাসে ক্যাবিনেট মিশন আবার প্রস্তাব পেশ করে। তাতেই ভারত ভাগের কথা বলা হয়।

ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় অধৈর্য জিন্না ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট 'প্রত্যক্ষ সংঘর্ষদিবস' পালনের ডাক দেন। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। ভয়ঙ্কর নরমেধযজ্ঞ বাংলার ইতিহাসকে কলঙ্কিত করে। দেশভাগ, অনাকাঙ্খিত হলেও, একটা অনিবার্যতা হিসেবে ক্রমশ চোখের সামনে আসতে শুরু করে।

১৯৪৬ সালের ২ সেপ্টেম্বর জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে গঠিত হয় অন্তবর্তী সরকার ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে। ২৬ অক্টোবর মুসলিম সদস্যরা অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। ৯ ডিসেম্বর ভারতীয় গণপরষদের প্রথম অধিবেশন বসে।

১৯৪৭ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি লর্ড মাউন্টব্যাটেন ভারতের বড়লাট হয়ে আসেন

লর্ড ওয়াভেলের জায়গায়। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন বড়লাট লর্ড মাউন্টব্যাটেন ব্রিটিশ সরকারের ভারতকে দু'ভাগে – ভারত ও পাকিস্তান – ভাগ করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। বলা হয়, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশকেও বিভক্ত করা হবে। উভয় প্রদেশের হিন্দু প্রধান জেলাগুলি যুক্ত হবে ভারতের সঙ্গে; আর মুসলিম প্রধান জেলাগুলি পাকিস্তানের সঙ্গে।

১৯৪৬-র প্রাদেশিক নির্বাচনে হিন্দু মহাসভা নেতা শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি একাই জিতেছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় আসন থেকে। হিসেব বলছে, ২৬টি আসনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রার্থী দাঁড় করিয়ে তাঁর দল মাত্র ২.৭৩শতাংশ হিন্দু ভোট ভোট পেয়েছিল। ব্রিটিশ-বিরোধী স্বাধীনতা সংগ্রামে কোনো ভূমিকা পালন না করলেও বাংলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রসারে তৎপর ভূমিকা পালন করে হিন্দু মহাসভা।

দাঙ্গার ক্ষত সত্ত্বেও বাংলা ভাগের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া হয়। শরৎ বসু,আসরাফউদ্দিন চৌধুরীর মতো কংগ্রেস নেতারা সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাজনের বিরোধিতা করে শেষ চেষ্টা চালালেও তা সফল হয়নি। বাংলা ভাগ রোখার শেষ প্রচেষ্টা হিসেবে ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কিরণশংকর রায়, শরৎ বসু, সুরাবর্দি (যথাক্রমে কংগ্রেস ও মুসলিম লিগ প্রাদেশিক নেতা) একযোগে অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলার একটি প্রস্তাব আনেন। বাংলা প্রদেশে মুসলিম লিগের অন্যতম শীর্ষনেতা আবুল হাশেমও অবিভক্ত বাংলার পক্ষে ছিলেন। অবিভক্ত ও স্বাধীন বাংলা গঠনের প্রস্তাবও বাস্তবে তেমন রাজনৈতিক সমর্থন পায়নি।

সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশ বিভাজন আটকানোর প্রচেষ্টা যখন চলছে তখন বাংলা ভাগের মঞ্চে প্রবেশ হিন্দু মহাসভার।

সাম্প্রদায়িক বিভাজনের সেই প্রেক্ষাপটে হিন্দু মহাসভা জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একাংশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাংলাভাগের পক্ষে সরব হন। ১৯৪৭সালের এপ্রিল মাসে (৪-৬এপ্রিল) তারকেশ্বরে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে শ্যামাপ্রসাদ বলেন ''সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে বাংলাকে দুই ভাগ করা ছাড়া'' কোনো উপায় নেই।

সাম্প্রদায়িক বিভাজন ১৯৪০-র দশকে বাংলায় শ্রমিক কৃষকের ক্রমবর্ধমান সংগ্রাম আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। ১৯৪৫-৪৬'-এ বামপন্থীদের উদ্যোগে একের পর এক গণবিক্ষোভ স্বাধীনতার লড়াইকে নতুন মাত্রা দিচ্ছিল। আই এন এ বন্দীদের মুক্তির দাবি থেকে ডাক ধর্মঘট, গ্রামাঞ্চলে কৃষক আন্দোলন তীব্রতা পাচ্ছিল। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্টের মাত্র উনিশ দিন আগে ২৯ জুলাইয়ের ঐতিহাসিক ধর্মঘট সংগঠিত হয়। সাম্প্রদায়িক বিভাজন সেই বিকাশমান লড়াইকেও আঘাত করে।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বাংলা আইনসভায় পশ্চিমবঙ্গের সদস্যরা ভারত ইউনিয়নে যোগদানের পক্ষে এবং পূর্ববঙ্গের সদস্যরা পাকিস্তানে যোগদানের পক্ষে প্রস্তাব পাশ করেন। ১৮ জুলাই ব্রিটিশ সংসদে গৃহীত হয় 'ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যাক্ট'। ২৭ জুলাই পাকিস্তানের জন্য পৃথক গণপরিষদ গঠিত হয়। ১৫ আগস্ট ক্ষমতার হস্তান্তর।

স্বাধীনতা-উত্তর পশ্চিমবঙ্গে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির ক্রমপ্রসারের পটভূমিতে

সাম্প্রদায়িক শক্তি জনগণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়। আর পূর্ববাংলায় ভাষা আন্দোলন ও গণতান্ত্রিক অধিকারের দাবিতে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ধর্মনিরপেক্ষ স্বাধীন বাংলাদেশ গঠনের জমি প্রস্তুত হতে শুরু করে। পূর্ব বাংলায় দ্রুত কোনঠাসা হয়ে পড়ে মুসলিম লিগ।

মৌলবাদী অপপ্রচার

‘গীতা কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, গীতাকে স্কুলস্তরে অবশ্যপাঠ্য করতে হবে।’

প্রকৃত সত্য

হিন্দুত্ববাদীদের হাত থেকে ‘গীতা’-রও রক্ষা নেই। ‘গীতা’-কে সামনে রেখে সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের বিপজ্জনক খেলায় মেতেছে সঙ্ঘ পরিবার। ২০১৪ সালে কেন্দ্রে নরেন্দ্র মোদী সরকার গঠনের পর তাদের তৎপরতা আরও বেড়েছে। ২০১৪ সালের ৭ই ডিসেম্বর সঙ্ঘ পরিবার-ঘনিষ্ঠ ‘জীও গীতা পরিবার’ নামে একটি সংগঠনের সভায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ‘গীতা’কে ‘জাতীয় গ্রন্থ’ ঘোষণা করার কথা তোলেন।

মোদী মন্ত্রিসভার সদস্য সুষমা স্বরাজকে দিয়ে প্রথমে বলানো হয়, গীতা কোনো ধর্মগ্রন্থ নয়, গীতা ভারতীয় সংস্কৃতির ‘দিক নির্দেশক’—গীতাকে ‘জাতীয় গ্রন্থ’ ঘোষণা করতে হবে এবং স্কুলস্তরে অবশ্যপাঠ্য করতে হবে।

প্রথমত, সকলেই জানেন, ‘গীতা’ অবশ্যই ধর্মগ্রন্থ। শ্রীকৃষ্ণ যেমন হিন্দুদের দেবতা, তেমনই ‘গীতা’ হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ। সঙ্ঘ পরিবার একথা জানে। কিন্তু, তাদের মতে ভারত শুধু ‘হিন্দু’দের দেশ! আর ভারতের সব অধিবাসীকেই হিন্দুধর্মই মানতে হবে! ভারতে যে বহুধর্মের মানুষ বাস করেন একথা তো সঙ্ঘ পরিবার মানে না! হিন্দু , মুসলিম নির্বিশেষে সব ছাত্র-ছাত্রীকে স্কুলে বাধ্যতামূলক ‘গীতা’ পড়ার নিদান দেওয়া হয়েছে এই মনোভাব থেকেই।

দ্বিতীয়ত, কী করে একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সংবিধান থাকার পরও একটি ধর্মগ্রন্থকে ‘জাতীয় গ্রন্থ’ ঘোষণা করা যায়? বলাবাহুল্য, সঙ্ঘ পরিবার এবং তাদের লোকজন এই স্বাভাবিক যুক্তি বুঝতে চান না। ‘গীতা’ সম্পর্কে সঙ্ঘ পরিবারের বিশেষ ধ্যানধারণা থাকার কোনো কারণ নেই। আসলে এধরনের বিতর্ক তুলে ‘গীতা’র ওপর তাদের দখলদারি কায়েম করতে চায়। ‘গীতা’ নিয়ে তারাই শেষ কথা বলবে, যাঁরা একমত হবেন না তাঁরা ‘হিন্দুদের শত্রু’। আসলে অনাবশ্যকভাবে ‘গীতা’-কেও সঙ্ঘ পরিবার সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের কাজে ব্যবহার করতে চায়।

তৃতীয়ত, সঙ্ঘ পরিবার ‘গীতা’ নিয়ে এক ধরনের যুক্তিহীন উন্মাদনা সৃষ্টি করতে চায়। এমনকি ধর্মীয় রচনা হিসেবেও বেদ, উপনিষদ বাদ দিয়ে ‘গীতা’-কে কেন বেছে নেওয়া হয়েছে, তারও কোনো ব্যাখ্যা নেই।

চতুর্থত, ‘গীতা’ সংখ্যাগুরু হিন্দুদের ধর্মগ্রন্থ হলেও তা শুধু হিন্দুরাই পড়েছেন বা পড়ে থাকেন, এমন নয়। অন্য অনেক লেখার মতো বহুভাষাভাষী ও বহু ধর্মের এই দেশে

ধর্মীয় গোঁড়ামি-মুক্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠেরও একটা ইতিহাস রয়েছে। মোঘল সম্রাট আকবরের উৎসাহে ফার্সি ভাষায় 'মহাভারত'-র অনুবাদ করা হয়। সম্রাট শাহজাহানের পুত্র দারা শিকো তেমনি উপনিষদ এবং 'গীতা'র ফার্সি অনুবাদ করেন। সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগের ঘটনা। সাংস্কৃতিক বিনিময়ের এই সব ঐতিহ্যকেই সঙ্ঘ পরিবার খারিজ করে দেয়।

অধ্যাপক সুকুমারী ভট্টাচার্যের মতো বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, বিশেষজ্ঞরা বলছেন, 'গীতা' রচিত হয় কুষাণ যুগে। অর্থাৎ,খ্রিস্টাব্দের হিসেবে প্রথম থেকে দ্বিতীয় শতকের মধ্যে। সুকুমারী ভট্টাচার্য মনে করতেন,'গীতা' মূল মহাভারতের অংশ নয়, পরে প্রক্ষিপ্ত। 'মহাভারত' কোন একজনের রচনা বলে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন না। রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিস্টীয় তৃতীয়-চতুর্থ শতক।

'গীতা'-র হিন্দুত্ববাদী আচারে নতুন মোড়ক অবশ্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত ধরেই। সরকারি সফরে মার্কিন রাষ্ট্রপতি বারাক ওবামাকে বি জে পি সরকারের প্রধানমন্ত্রী একটি 'গীতা' উপহার দেন।

মৌলবাদী অপপ্রচার

'মহরমের জলুসে অস্ত্র থাকলে রাম নবমীর ধর্মীয় মিছিলে গদা, তরোয়াল থাকতেই পারে।'

প্রকৃত সত্য

দেশের সংবিধান ও আইনের শাসন মানলে কোনো ধরনের প্রকাশ্য সমাবেশেই অস্ত্র প্রদর্শন করা যায় না। তা সে ধর্মীয় বা সামাজিক যাই হোক না কেন। তাছাড়া ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালনের রীতিনীতিও পরিবর্তনশীল। অনেক প্রাচীন রীতি যা ধর্মাচরণ হিসেবে অতীতে প্রচলিত হতো তাও কালক্রমে পরিত্যাজ্য হয়েছে–এমন নজিরও কম নয়।

সম্প্রতি এরাজ্যে রাম নবমীর মিছিলকে কেন্দ্র করে সঙ্ঘ পরিবার ও ভারতীয় জনতা পার্টি যা করলো তা হিন্দু ধর্মাচরণে কোথায় বলা হয়েছে তা একমাত্র তারাই জানে। প্রথমত, নামে রামনবমীর মিছিল হলেও তা ছিল নেহাতই অজুহাত। বি জে পি-র পরিচিত নেতা-নেত্রী, এমনকি দলের রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক পর্যন্ত খোলা তলোয়ার হাতে মিছিলে অংশ নেন। এরকম রাজনৈতিক রামনবমী এরাজ্য অতীতে দেখেনি। এরকম উচ্চকিত রাজনৈতিক ধর্মাচরণও পশ্চিমবঙ্গ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে দেখেনি।

বাদ যাননি রাজ্যের শাসক তৃণমূল দলের নেতা-নেত্রী, মন্ত্রী, বিধায়করাও। বি জে পি, সঙ্ঘ পরিবার নেতাদের পাশাপাশি তলোয়ার হাতে তাঁরাও মিছিলে অংশ নেন।

সঙ্ঘ পরিবারের কর্মসূচি সফল করতে যেভাবে রাজ্যের শাসকদল এবং কেন্দ্রের শাসক দল পথে নামলো তা রাজ্যের ভবিষ্যতের পক্ষে অশুভ সঙ্কেতবাহী।

মৌলবাদী অপপ্রচার

‘বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশ পশ্চিমবঙ্গে’

প্রকৃত সত্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রসঙ্গে সঙ্ঘ পরিবার লাগাতার ‘অনুপ্রবেশ’ নিয়ে হইচই করে। বাস্তবে বেআইনি অনুপ্রবেশ নিয়ে গেরুয়া মৌলবাদীদের কোনো মাথাব্যথা নেই। দক্ষিণ বঙ্গে ওরা এসব বলে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার লক্ষ্যে; সাম্প্রদায়িক মেরুকরণ গভীরতর করতে। ‘অনুপ্রবেশ’-র প্রসঙ্গ উঠলেই সঙ্ঘ পরিবার বামপন্থীদের বিরুদ্ধে যুক্তিহীনভাবে সরব হয়।

কিন্তু প্রকৃত তথ্য কী? পশ্চিমবাংলা একটি সীমান্তবর্তী রাজ্য। ২০১১-র জনগণনা অনুযায়ী, আমাদের দেশে সামগ্রিকভাবে জনসংখ্যার ১৪.২৩ শতাংশ মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত। যে যে রাজ্যে জাতীয় গড়ের চেয়ে মুসলিম জনসংখ্যা বেশি তারমধ্যে অন্যতম মিজোরাম (মুসলিম জনসংখ্যা ৪৬.৯%), হরিয়ানা (৪৫.৭%), চণ্ডীগড় (৪৪.৭%), দিল্লি (৩৩ %), আসাম (২৯.৬%), বিহার (২৮%)। পশ্চিমবাংলায় মুসলিম জনসংখ্যা ২৭.০১ শতাংশ।

সঙ্ঘ পরিবার ঘোষিতভাবেই ‘অনুপ্রবেশ’ বিরোধী নয়। তারা বলে, মুসলিম ধর্মাবলম্বীরা এদেশে ঢুকলে তা ‘অনুপ্রবেশ’, হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা এদেশে ঢুকলে তারা ‘আশ্রয়প্রার্থী’। ‘অনুপ্রবেশ’ জটিল সমস্যা হলেও কোনো ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে এবং আমাদের দেশের প্রচলিত আইনে ‘অনুপ্রবেশকারী’-দের ধর্মের ভিত্তিতে এভাবে ভাগ করার পূর্বনজির নেই। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের লক্ষ্যেই সঙ্ঘ পরিবার তা করছে।

তাছাড়া, দক্ষিণবঙ্গে যে সঙ্ঘ পরিবার ‘অনুপ্রবেশ’ নিয়ে এত ‘উদ্বিগ্ন’, তারাই আবার উত্তরবঙ্গে সেই সব বিচ্ছিন্নতাবাদীদের মদত দেয় যারা পশ্চিমবঙ্গকে নতুন করে ভাগ করার ষড়যন্ত্রে যুক্ত।

আসলে হিন্দুত্ববাদীরা কখনই শরণার্থী সমস্যার সমাধান নিয়ে মাথা ঘামাতে চায়নি। বাংলাভাগ এবং তৎপরবর্তী সময়ে শরণার্থী পুনর্বাসন ও সমস্যার সুষ্ঠু মোকাবিলা নিয়ে বি জে পি কোনোদিন মুখ খোলেনি। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণকে তীব্র ও তীক্ষ্ণ করার উদ্দেশ্যে এখন রাস্তায় নেমেছে। তাদের এই ভূমিকায় হিন্দুত্ববাদীরা যেমন উৎসাহিত হবে তেমনই সক্রিয় হবে মুসলিম মৌলবাদী জঙ্গিগোষ্ঠীগুলি। ‘অনুপ্রবেশ’-র সমস্যা এতে বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে ‘অনুপ্রবেশ’-র সমস্যা নিয়ে বিদ্বেষমূলক প্রচার চালাচ্ছে বি জে পি এবং সঙ্ঘ পরিবার। উদ্বাস্তু সমস্যাকে তারা সাম্প্রদায়িক বিভাজন বাড়ানোর লক্ষ্যে ব্যবহার করছে। বিভাজনের রাজনীতি থেকে ফায়দা তুলতে চাইছে তৃণমূল কংগ্রেস।

‘বাংলাদেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর আক্রমণ’

প্রকৃত সত্য

ধর্মীয় বা ভাষাগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় নীতির চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য যেকোন দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মানদণ্ড। ভারত ভাগের পর পূর্ব পাকিস্তান ও পরবর্তীকালে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা হলো, গণতন্ত্রের জন্য যাঁরা লড়াই করেছেন, তাঁরাই তুলে ধরেছেন ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি। সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার দাবিতেও সংগ্রাম করেছেন বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিই। সেদেশে ধর্মনিপেক্ষতার পক্ষে দাঁড়িয়ে যাঁরা প্রাণ দিচ্ছেন তাঁদের বেশির ভাগই জন্মসূত্রে মুসলিম। সেদেশেও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু যারা তারাই গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিকে স্বৈরাচারী পদক্ষেপ নিয়ে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে।

সামরিক বাহিনীর মদতপুষ্ট স্বৈরাচারী সরকার যতবার বাংলাদেশে ক্ষমতায় এসেছে ততবারই তারা মুসলিম মৌলবাদীদের রাজনৈতিক স্বার্থপূরণে কাজে লাগিয়েছে। সেদেশের সংখ্যালঘুরা আক্রান্ত হয়েছেন স্বৈরাচারী রাজনৈতিক শক্তি ও মৌলবাদী শক্তির হাতে। স্বৈরাচারী রাজনৈতিক শক্তি ও মৌলবাদীরা যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ওপর আক্রমণ চালিয়েছে তখন তারা ধর্মের বাছবিচার করেনি-- গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশ নিলে রেহাই পায়নি জন্মসূত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তরাও। মুসলিম মৌলবাদীরা সেক্ষেত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদেরকেও ছেড়ে দেয়নি।

সঙ্ঘ পরিবার যখন মুসলিমদের অসহিষ্ণুতা নিয়ে এত কথা বলছে তখন আর এস এস-র প্রধান তাত্ত্বিক এম এস গোলওয়ালকার তাঁর ‘উই অর আওয়ার নেশনহুড ডিফাইন্ড’ (১৯৩৮) গ্রন্থে কী লিখে গেছেন তা পড়ে নেওয়া দরকার। গোলওয়ালকার লিখেছেন, “The non-Hindu in Hindustan must either adopt the Hindu religion…. or may stay in the country wholly subordinate to the Hindu nation claiming nothing, deserving no privileges, far less an preferential treatment, not even citizen’s right.” (“হিন্দুস্তানে অ-হিন্দুদের হয় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করতে হবে...অথবা তাদের হিন্দু জাতির সম্পূর্ণ অধীনস্ত হয়ে থাকতে হবে। কোনো সুযোগসুবিধা তারা পাবে না। বাড়তি কিছু পাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি নাগরিকদের অধিকারও তারা পাবে না।’)

গোলওয়ালকারের উত্তরসূরিদের কী বাংলাদেশ নিয়ে কথা বলা সাজে!

মৌলবাদী অপপ্রচার________

‘আর্যরা ভারতেরই ভূমিপুত্র।’

প্রকৃত সত্য

আর্যরা ভারতেরই আদি বাসিন্দা এমন কথা কোনো স্বীকৃত ইতিহাসবিদ না মানলেও সঙ্ঘ পরিবার তা বলে যায় কেন? কারণ, ভারতের ইতিহাসের সেই বিবরণই সঙ্ঘ পরিবার চায় যা তাদের হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক কর্মসূচী রূপায়ণে কাজে আসবে। সঙ্ঘ পরিবার দাবি করে, আর্যরা ভারত ভূখণ্ডে আগে থেকেই ছিল, তারা অন্য জায়গা থেকে আসেনি।

প্রথমত, হিন্দু ধর্মের উচ্চবর্ণের প্রতিভূ আর্যরা মুসলিমদের মতনই অন্য ভূখণ্ড থেকে এসেছে এই সত্য মানলে সঙ্ঘ পরিবারের হিন্দু ভারতের ‘তত্ত্ব’ দাঁড়ায় না। আর্যরা ‘ভূমিপুত্র’ এবং মুসলিমরা ‘বহিরাগত’ – এই তত্ব বোঝাতে পারলেই ভারত আদি অনন্তকাল ধরে ‘হিন্দু’দের দেশ বোঝাতে তাদের সুবিধা হয়। দ্বিতীয়ত, সঙ্ঘ পরিবার প্রচার করে, ভারত উচ্চবর্ণের ‘হিন্দু’দের দেশ, আর্যরা যাদের প্রতিনিধি। অনার্যরাই ভারত ভূখণ্ডে আদিমতম বাসিন্দা – এমন তথ্য সঙ্ঘ পরিবারের উচ্চবর্ণবাদী ও মনুবাদী রাজনীতির সঙ্গে মেলে না।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর অননুকরণীয় ভাষায় লিখেছিলেন–

‘‘কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন–
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।’’

ইতিহাসবিদরা বলেন, ভারতে সভ্যতার ইতিহাস প্রায় পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ সালে হরপ্পা সভ্যতার উত্থান। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ সাল নাগাদ তা অনেকটা পরিণত রূপ পায়। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়ে হরপ্পা সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে। অনেক বিশেষজ্ঞ বলেন খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সময় পর্যন্ত হরপ্পা সভ্যতা টিকে ছিল।

বৈদিক যুগ বলতে বোঝায় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ পর্যন্ত সময় পর্ব। ঐসময় পর্বটি ঋকবেদ থেকে উপনিষদ, বৈদিক সাহিত্যেরও সময়। তারপর ব্রাক্ষণ্যযুগ ও বৌদ্ধযুগ। মোটামুটিভাবে খ্রিস্টাব্দ তিনশো-চারশো পর্যন্ত। খ্রিস্টপূর্ব ৭০০-৮০০থেকে, অর্থাৎ, আজ থেকে ২৭০০-২৮০০ বছর আগে ভারত ভূখণ্ডে লোহার ব্যবহার শুরু হয়। হরপ্পা সভ্যতা লোহার ব্যবহার জানতো না। তা ব্যবহৃত হতো ব্রোঞ্জ। লোহার ব্যবহার ছিল কৃষির বিস্তারে সাহায্য করেছিল।

আর্যরা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রবেশ করে বিশেষজ্ঞদের মতানুযায়ী, পশ্চিমএশিয়া থেকে এবং মোটামুটিভাবে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সাল নাগাদ। ফলে আর্যরা ভারতের ‘ভূমিপুত্র’ এবং সিন্ধু সভ্যতা আর্যদের সৃষ্টি –একথা নিছকই গল্পকথা।

সর্বোপরি, সঙ্ঘ পরিবারের 'ইতিহাস চর্চা' মূলত জাতিবিদ্বেষী এবং সাম্প্রদায়িক ঔপনিবেশিক ধারারই অনুসারী। ১৮১৭ সালে লন্ডনে প্রকাশিত হয় ব্রিটিশ লেখক জেমস মিলের 'দি হিস্ট্রি অফ ব্রিটিশ ইন্ডিয়া'। ভারত-ইতিহাস চর্চাকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক স্বার্থপূরণের লক্ষ্য পূরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করতে এই বইকে দীর্ঘদিন ব্যবহার করা হয়েছে। মিলই প্রথম ভারত ইতিহাসকে তিনটি পর্বে বিভক্ত করেন– 'হিন্দু', 'মুসলিম' এবং 'ব্রিটিশ' পর্ব। 'ব্রিটিশ' পর্বকে জেমস মিল কিন্তু 'খ্রিস্টান' পর্ব বলেননি! মুসলিমদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করা ছিল ব্রিটিশ উপনিবেশবাদীদের ভয়ংকর কূটনীতির অংশ।

শুধু ঔপনিবেশিক শাসকরাই নয়, মিলের পন্থা অনুসরণ করেছে সঙ্ঘ পরিবারও। সঙ্ঘ পরিবার কখনও ঔপনিবেশিকতা-বিরোধী সংগ্রামের কোনো স্তরে যুক্ত ছিল না। তাই, ইতিহাস চর্চা হোক বা সম্প্রদায়গত পরিচয় নির্ধারণ, প্রতিক্রিয়াশীল ঔপনিবেশিক প্রবণতাগুলিই সঙ্ঘ পরিবার সব সময় আত্মস্থ করেছে।

মৌলবাদী অপপ্রচার
'টিপু সুলতান হিন্দু বিদ্বেষী ছিলেন।'

প্রকৃত সত্য

১৭৯৯ সালের ৪ঠা মে মাত্র ৪৯ বছর বয়সে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের আক্রমণকারী সশস্ত্র বাহিনীর হাতে নিহত মহীশূরের সম্রাট টিপু সুলতানকে নিয়ে সঙ্ঘ পরিবার একুশ শতকের ভারতেও অপপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ব্রিটিশরা নিহত টিপু সুলতানের শিশু সন্তান এবং নিকট পরিজনদের পর্যন্ত রেহাই দেয়নি। মহীশূর থেকে তাদের জবরদস্তি তুলে এনে কিছু জমিজমা দিয়ে বসিয়ে দেওয়া হয় তৎকালীন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতার কাছে টালিগঞ্জে। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসন টিপু সুলতানের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে চেয়েছিল।

সেই টিপু সুলতানকে 'হিন্দু বিদ্বেষী' বলে চিহ্নিত করে এখনও প্রচার চালিয়ে যায় সঙ্ঘ পরিবার। উদ্দেশ্য একটাই, যে কোনো অজুহাতে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে মিথ্যাচার চালানো এবং সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সম্প্রীতির গৌরবজনক ইতিহাস মুছে ফেলা। এর ফলে সঙ্ঘ পরিবারের সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনীতির সুবিধা হয়।

টিপু সুলতান সামন্ততান্ত্রিক শাসক হিসেবে সে যুগের মানদণ্ডে সহনশীল ছিলেন। তাঁর প্রধানমন্ত্রী পুরানাইয়া ছিলেন হিন্দু। কোষাধ্যক্ষও ছিলেন হিন্দু -- কৃষ্ণ রাও। মুঘল দরবারে টিপুর প্রতিনিধি ছিলেন দু'জন হিন্দু কর্মচারী। হিন্দু মন্দিরগুলির জন্য তিনি উদার হস্তে সাহায্য দিতেন। শ্রীঙ্গেরী মঠের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ছিল যথেষ্ট হৃদ্যতাপূর্ণ। ১৭৯১ সালে মারাঠিদের হাতে আক্রান্ত হলে শ্রীঙ্গেরী মঠের তরফে টিপু সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করা হয়। শ্রীঙ্গেরী মঠের সুরক্ষায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন টিপু সুলতান।

অষ্টাদশ শতকের শেষপ্রান্তে ক্রমপ্রসারিত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক নিয়ন্ত্রণ টিপু সুলতানের

মতো সামন্ততান্ত্রিক রাজন্যবর্গের স্বার্থবিরোধী হয়ে উঠেছিল। টিপু সুলতানকে 'নিষ্ঠুর' ও 'হিন্দুবিরোধী' শাসক হিসেবে চিহ্নিত করার প্রকল্প প্রথম হাতে নেয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসকরা। এভাবেই ইতিহাস বিকৃত করে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক জমানা টিপু সুলতানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের অজুহাত খাড়া করে। ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকরা জানতো, পথের কাঁটা সরাতে সাম্প্রদায়িক বিভাজন কার্যকর ব্যবস্থা।

সঙ্ঘ পরিবার জন্মসূত্রে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসকদের ধামাধরা। হিন্দু মহাসভা, আর এস এস'র মতো সংগঠনগুলিকে ব্রিটিশ শাসকরা তাই প্রথম দিন থেকেই ভরসা করেছে। টিপু সুলতান সম্পর্কে ঔপনিবেশিক প্রভুদের ব্যাখ্যাই সঙ্ঘ পরিবার শিরোধার্য করেছে।

ভারতের মুসলিম নবাব ও সম্রাটরা হিন্দুবিদ্বেষী ছিলেন এই অনৈতিহাসিক 'তত্ব' সঙ্ঘ পরিবার খাড়া করতে চায় তাদের সাম্প্রদায়িক বিভাজনের রাজনীতিকে জোরালো করতে। রাজা ধর্মাচরণে মুসলিম হলেও সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোয় শাসক শ্রেণিগুলির মধ্যে যে মুসলিম এবং হিন্দুর যৌথ অংশীদারিত্ব ছিল, ইতিহাসের এই সহজ সত্য সঙ্ঘ পরিবার মানতে নারাজ।

টিপু সুলতানকে সঙ্ঘ পরিবার বিশেষ ভাবে লক্ষ্যবস্তু করেছে, তার কারণ টিপু সুলতান ঐতিহাসিক কারণেই ভারতীয় ভূখণ্ডে ব্রিটিশ আগ্রাসনবিরোধী চরিত্র হিসেবে স্বীকৃত। 'বহিরাগত আগ্রাসনকারী' হিসেবে এই মুসলিম রাজাকে চিহ্নিত করতে না পারলে সঙ্ঘ পরিবারের 'অঙ্ক' মিলছে না!

মৌলবাদী অপপ্রচার
'বাবরি মসজিদ মন্দির ভেঙে তৈরি'

প্রকৃত তথ্য

উত্তর প্রদেশের অযোধ্যায় হিন্দু মন্দির ভেঙে বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছিল এমন কোনও গ্রহণযোগ্য প্রমাণ আজ পর্যন্ত মেলেনি। মূল নির্মাণকালের (১৫২৮-২৯) সময় পাওয়া ১৪টি ফার্সি শিলালিপির কোনোটিতেই এর কোনও উল্লেখ পাওয়া যায়নি। এই লিপি সরকারিভাবে প্রকাশিত 'এপিগ্রাফিয়া ইন্ডিকা, অ্যারাবিক অ্যান্ড পারসিয়ান সাপ্লিমেন্ট'(১৯৬৫)-এ ছাপা হয়েছে। যদি সত্যিই মন্দির ভাঙা হতো তাহলে এই লিপিতে তার উল্লেখ থাকতো। ১৯৯১-এ প্রকাশিত আর এস শর্মা, এম আখতার আলি, ডি এন ঝা এবং সুরজ খানের মতো বিশিষ্ট ইতিহাসবিদদের লিখিত 'হিস্টোরিয়ানস রিপোর্ট টু দ্য নেশান' বইয়ে স্পষ্টভাবে জানানো হয়েছে যে, কোনও মন্দিরের জায়গায় বাবরি মসজিদ তৈরি হয়েছে বলে কোনও সাক্ষ্য প্রমাণ নেই।

মসজিদ তৈরির আড়াইশো বছরের মধ্যেও এ রকম কোনও দাবি তোলা হয়নি। একমাত্র ১৮১১ সালে একজন ব্রিটিশ সাংবাদিক এমন দাবির কথা শুনেছিলেন।

সঙ্ঘ-ঘনিষ্ঠ বি বি লাল তথাকথিত 'মহাভারত স্থাপত্যবিদ্যার' উদ্‌গাতা। তিনি বাবরি মসজিদের কাছে 'খননকার্য' শুরু চালিয়ে ১৯৭৬-৭৭-এ একটি রিপোর্ট পেশ

করেন। ১৯৯০-এর অক্টোবরে আর এস এস-র অন্যতম মুখপত্র 'মন্থন'-এ তিনি তাঁর সেই রিপোর্টের পুনর্ব্যাখ্যায় বলেন, তিনি সেখানে যে স্তম্ভ উদ্ধার করেছিলেন সেগুলি মূল মন্দিরের সম্প্রসারিত অংশই। কিন্তু ১৯৯৩-এ প্রকাশিত 'অযোধ্যা, আর্কিওলজি আফটার ডিমোলিশন' বইয়ে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় যে বি বি লাল-র ওই বক্তব্য ভিত্তিহীন। বি বি লাল নিজের যুক্তির দুর্বলতা সম্পর্কে জানতেন বলেই, তিনি বলেছিলেন, বাবরি মসজিদের ভিত্তি পুরোপুরি খুঁড়লেই মূল সত্য বেরোবে।

এই ক্ষেত্রে বাবরি মসজিদ সংক্রান্ত মামলায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের এক সাক্ষীর উল্লেখ করা যায়। তাঁর নাম কে ভি রমেশ। তিনি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার এপিগ্রাফি বিভাগের অধিকর্তা ছিলেন। তাঁর একটি লিপি অনুবাদ আদালতে পেশ করেছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। সেখানে লেখা ছিল,'Noble was that very family (of the local rulers), which was the birth place (janmobhoomi) of Valour which had successfully removed the suffering of the other (Khatriya Clans)'। অর্থাৎ, ওই জায়গাটির সঙ্গে জন্মভূমি বলে কোনও নির্দিষ্ট জায়গার উল্লেখ নেই। ওই জায়গাটির সঙ্গে যুক্ত ছিল একটি অভিজাত পরিবার। (ইরফান হাবিব, বাবরি মসজিদ ভাঙার 'ঐতিহাসিক যুক্তি')

এপ্রসঙ্গে বলা যায়, বাবরি মসজিদ এবং রাম মন্দির বিতর্কটি উসকে রাখতে বরাবরই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১৮৫৭-র ১০ই মে সিপাহী বিদ্রোহ শুরু। অনেক ঐতিহাসিকের মতে ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম। লড়াইয়ে ব্রিটিশবিরোধী অংশের নেতৃত্বে ছিলেন প্রধানত সামন্তপ্রভুরা। তাঁদের মধ্যে ছিলেন –নানা সাহেব, তাঁতিয়া টোপি, রানি লক্ষ্মীবাঈ, বেগম হজরত মহল, বিরজিস কাদির, উজ্জয়িনীর রাজা বাবু কুনওয়ার সিং, তুলসিপুরের সামন্ত দ্রিগ নারায়ণ সিং এবং দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ্ প্রমুখ। এই যুদ্ধে ব্রিটিশরা জয়লাভ করে, বিদ্রোহ ব্যর্থ হয়।

কিন্তু ভারতের তৎকালীন মুসলিমদের সম্পর্কে খুবই সন্দেহপ্রবণ হয়ে পড়ে ব্রিটিশরা। মুসলিমদের মধ্যে ব্রিটিশদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়ারও শুরু ওই সময় থেকেই। ইংরেজি শিক্ষা থেকে ব্রিটিশদের যাবতীয় শিক্ষা থেকে নিজেদের সরিয়ে নিয়ে ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকে মুসলমানরা।

ঐতিহাসিক ড. আর এস শর্মার কথায়,''মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুর ধর্মীয় ভাবাবেগকে ব্যবহার করা'' –এটা ছিল উনিশ শতকে ইংরাজ উপনিবেশবাদীদের শোষণমূলক এক ভয়ংকর কূটনীতি। এই সময় থেকেই কিছু ইংরাজ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিদ গবেষক মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে নির্যাতন ও হিন্দু মন্দির ধ্বংসের একটানা বিরামহীন অভিযোগগুলি লিপিবদ্ধ করে একটা কথা ভারতবাসীকে বোঝাতে চাইলেন যে, তুলনামূলকভাবে ব্রিটিশ শাসন ভারতবাসীর কাছে কতখানি অভিপ্রেত হতে পারে। ব্রিটিশ ইতিহাস গবেষণার সবচেয়ে ভালো নমুনা পাওয়া গিয়েছে তদানীন্তন ভারত সরকারের সচিব এম এইচ এলিয়ট কর্তৃক তাঁর 'বিবলিওগ্রাফিক্যাল ইনডেক্স টু দ্য হিস্টোরিয়ান অব

মহামেডান ইন্ডিয়া'-র প্রথম মুখবন্ধ অংশের লেখা থেকে। পুস্তকখানি ১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে কলকাতায় প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে ডবসনের সঙ্গে যৌথভাবে 'হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়া অ্যাজ টোল্ড বাই ইটস হিস্টোরিয়ানস' পুস্তকের অষ্টম খণ্ডের গ্রন্থকার হিসাবে এলিয়ট তাঁর উপরোক্ত প্রসিদ্ধ পুস্তক 'বিবলিওগ্রাফিকাল ইন্ডেক্স টু দি হিস্টোরিয়ানস অফ মহামেডান ইন্ডিয়া'- তে সমগ্র সুলতানী আমল এবং মোগল সম্রাটদের রাজত্বকাল একত্র বর্ণনা প্রসঙ্গে মুসলমান শাসকদের তীব্র ভাষায় নিন্দা করেছেন। এলিয়ট আশা করতেন, 'একবার এই পুস্তকখানি প্রকাশিত হলে যে সকল বাগসর্বস্ব এদেশীয় বাবুরা আমাদের সরকারের অধীনে উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন এবং মাঝেমাঝে দেশাত্মবোধক কথাবার্তার সঙ্গে তাঁদের বাগাড়ম্বরপূর্ণ আলোচনা করতে অভ্যস্ত, তাঁদের কথায় ইংরেজরা আর কর্ণপাত করবেন না।'

এইভাবে ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে অযোধ্যায় সৌধগুলির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এলিয়ট অসমর্থিত কতকগুলি আঞ্চলিক জনশ্রুতিকে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তুলে ধরে লেখেন, জন্মস্থানের (রাম জন্মস্থানের) একটি মন্দির সমেত অযোধ্যার তিনটি মন্দির মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। (দি মনুমেন্টাল অ্যান্টিকুইটিস অ্যান্ড ইনস্ক্রিপশন ইন দি নর্থ-ওয়েস্টার্ন প্রভিন্সেস অ্যান্ড আউধ, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া, এলাহাবাদ, ১৮৯১, পৃষ্ঠা ২৯৭)

তিনি আরও লেখেন, ''আধুনিক ব্রাহ্মণ্য এবং জৈন মন্দির সকল মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই সকল প্রাচীন মন্দিরগুলির উপরই গড়ে উঠেছে।...এই সকল বিবৃতিগুলি তখনই প্রচার করা হয়েছিল, যখন সিপাহী বিদ্রোহের স্মৃতি জাতীয় মানসে তখনও উজ্জ্বল হয়ে আছে।'' (রামশরণ শর্মা, গবেষক-অধ্যাপক, জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, 'কমিউন্যাল হিস্ট্রি অ্যান্ড রাম'স অযোধ্যা', ১৯৯০)।

বলাবাহুল্য, সঙ্ঘ পরিবার এবং বি জে পি'র তথাকথিত মন্দির-মসজিদ বিতর্কের রসদ এসেছে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক জমানার অপপ্রচার থেকেই।

১৯৯২ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাবরি মসজিদ ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবার পরও কোনো মন্দিরের প্রমাণ মেলেনি। সঙ্ঘ পরিবার তথ্য ও যুক্তি মেলাতে না পারলে 'বিশ্বাস'-র কথা তোলে।

মোদী সরকারের জমানায় বিশেষত উত্তর প্রদেশে বি জে পি সরকার গঠন করার পর রাম মন্দির নির্মাণের হুমকি বেড়েছে। মন্দির নির্মাণের দাবিকে কেন্দ্র করে গোটা দেশে তারা পরিস্থিতি নতুন করে উত্তপ্ত করতে চায়।

এর মধ্যে গত ১৯শে এপ্রিলে (২০১৭) প্রদত্ত সুপ্রিম কোর্টের রায়কে শুভবুদ্ধিসম্পন্ন সকলেই স্বাগত জানায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ঘটনায় এল কে আদবানি, মুরলীমনোহর যোশী, উমা ভারতী, বিনয় কাটিয়ারদের সুপ্রিম কোর্ট বিরুদ্ধে পুনরায় ফৌজদারি চরিত্রের ষড়যন্ত্রের ধারা যুক্ত করার জন্য সুপ্রিম কোর্ট সি বি আই-কে অনুমতি দিয়েছে।

বাবরি ধ্বংসের মামলায় আদবানিদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের ধারা বাদ দিয়েছিল সি বি আই। দায়রা আদালতে এই ধারা থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন আদবানিসহ ২১ জন।

পরে এলাহাবাদ হাইকোর্টেও ষড়যন্ত্রের ধারা বাদ হয়ে যায়। বাবরি মসজিদ ধ্বংসের ২৫ বছর পরেও কেউই শাস্তি পায়নি। সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, ওই ধ্বংসকাণ্ড সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ কাঠামোর ভিত্তি নাড়িয়ে দিয়েছিল; ওই ঘটনা এক গুরুতর অপরাধ। দু'বছরের মধ্যে মামলা শেষ করারও নির্দেশ দিয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালত।

মৌলবাদী অপপ্রচার
'তাজমহল আসলে হিন্দু রাজার নির্মিত মন্দির।'

প্রকৃত সত্য

ইতিহাস নিয়ে মিথ্যাচার মৌলবাদীদের মজ্জাগত। গেরুয়া মৌলবাদীরা যেমন তাজমহলকে হিন্দু রাজা নির্মিত মন্দির দাবি করে থাকে। তাজমহলকে তারা বেছে নিয়েছে ,কারণ তাজমহলের দুনিয়াজোড়া খ্যাতি এবং তাজমহল নিয়ে দেশের সব অংশের মানুষের গর্ব। সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে হিন্দুত্ববাদীরা জানে তাজমহল নিয়ে প্রশ্ন তুললে দেশের মধ্যে, এমনকি দেশের বাইরের বিরাট অংশের মানুষের নজর কাড়া যায়।

মোঘল সম্রাট শাহজাহানের আমলে নির্মিত তাজমহলের কাজ শুরু হয় ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে। সব কাজ শেষ হয় ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইউনেস্কো তাজমহলকে ঐতিহ্যশালী সৌধ হিসেবে ঘোষণা করে ১৯৮৩ সালে। ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির ঐতিহ্যের প্রতিভূ হিসেবে তাজমহলের স্বীকৃতি প্রশ্নাতীত। দেশের এবং দেশের বাইরের বিখ্যাত ইতিহাসবিদ এবং বিশেষজ্ঞ পুরাতত্ত্ববিদরা তাজমহলের ওপর বহু উচ্চমানের গবেষণা করেছেন। কোনো স্বীকৃত বিশেষজ্ঞ তাজমহলকে কখনই হিন্দু মন্দির বলেননি। তাজমহলের প্রশাসনিক ভার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে। তাজমহল নিয়ে সরকারি ওয়েবসাইট রয়েছে, তাতেও এমন দাবি করা হয়নি।

তাজমহল হিন্দু রাজার তৈরি মন্দির এই দাবি ২০০০ সালের জুলাইয়ে সুপ্রিম কোর্টের ডিভিসন বেঞ্চ বাতিল করে দেয়। বিচারপতিদের সমালোচনার মুখে আবেদনকারীর আইনজীবী পিটিশনটি প্রত্যাহার করে নেয়। ২০০৫ সালে প্রায় অনুরূপ একটি দাবি এলাহাবাদ হাইকোর্টও খারিজ করে দেয়। তবুও সঙ্ঘ পরিবারের অপপ্রচার অব্যাহত।

মৌলবাদী অপপ্রচার
'ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিমদের কোনো ভূমিকা নেই।'

প্রকৃত সত্য

সঙ্ঘ পরিবার বলে থাকে, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে নাকি মুসলিম সম্প্রদায়ভূক্তদের কোনো ভূমিকা নেই। বাস্তবে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছিল ভারতীয়দের মিলিত সংগ্রাম। যতক্ষণ না পর্যন্ত জাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সব

সম্প্রদায়ের ভারতীয় অংশ নিয়েছেন ততক্ষণ আমাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন পরিণত রূপ গ্রহণ করেনি। বস্তুতপক্ষে, ঔপনিবেশিকতাবিরোধী জাতীয় মুক্তি আন্দোলনই এদেশে গোষ্ঠী ও পরিচিতি সত্তার সংকীর্ণতা অতিক্রমী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে অবদান রেখেছে। 'স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম সম্প্রদায়ের ভূমিকা নেই' – সঙ্ঘ পরিবারের এই অপপ্রচার আসলে তাদের সংখ্যালঘুবিরোধী সাধারণ কর্মসূচীরই অংশ।

ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম ১৮৫৭-র 'সিপাহী বিদ্রোহ'-এর ইতিহাস ব্রিটিশ আধিপত্যবিরোধী সংগ্রামে হিন্দু, মুসলিমদের মিলিত সংগ্রাম। ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠার পর জাতীয় কংগ্রেস শক্তিশালী হয় হিন্দু-মুসলিমদের মিলিত আন্দোলনে। ১৯২০সালে তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সাহায্যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে দেশত্যাগী মুহাজিরদের অবদান অবিস্মরণীয়। প্রবাসী বিপ্লবীদের মধ্যে ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্তদের অংশগ্রহণ আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করেছে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের ৩৬তম অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলে প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন মৌলানা হসরৎ মোহানী। জাতীয় কংগ্রেসের মঞ্চে সেই প্রথম কেউ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করেন।

খিলাফত আন্দোলন এবং অসহযোগ আন্দোলনের বহুমাত্রিক প্রভাবও সাধারণ মুসলিম সমাজের বহুজনকে কালক্রমে ঔপনিবেশিকতাবিরোধী আন্দোলনে টেনে এনেছে। আবুল কালাম আজাদ ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র।

অষ্টাদশ-উনিশ শতক থেকে দেশের নানা প্রান্তে যে কৃষক বিদ্রোহগুলি ধর্মীয় পরিচয়ের সংকীর্ণ গন্ডী অতিক্রম করতে প্রেরণা জুগিয়েছিল। ১৯৩০-র দশকে সারা ভারত কৃষক সভার প্রতিষ্ঠা কৃষক সমাজের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। সংগঠিত কৃষক আন্দোলন আমাদের দেশে বিকশিত হবার অন্যতম জরুরি শর্ত মুসলিম সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ। ১৯৪০-র দশকে তেভাগা আন্দোলন প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল; কারণ তা ছিল হিন্দু-মুসলিম কৃষক সমাজের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন।

অক্টোবর বিপ্লবের পর রাশিয়ায় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মীয় সম্প্রদায়ের একতা, বৈষম্যের অবসান এবং অসম উন্নয়নের সমস্যা অতিক্রমের আন্তরিক প্রচেষ্টা ভারতীয় জনগণের ওপর ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কমিউনিস্ট আন্দোলন বিকশিত হয়েছে হিন্দু-মুসলিম অসাম্প্রদায়িক ঐক্যের প্রতিভূ হিসেবেই। মুজফ্ফর আহ্মেদ, আব্দুল হালিম কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছেন সেই বাতাবরণেই। নজরুল ইসলামের অবদান নেই স্বাধীনতা সংগ্রামে?

শ্রেণি আন্দোলনের ক্রমবিকাশ সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতামুক্ত রাজনৈতিক পরিসরের নতুন পটভূমি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে তা নতুন উপাদান যুক্ত করে।

১৯৪০-র দশকে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে গঠিত আজাদ হিন্দবাহিনীতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন জন্মসূত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বহু মানুষ। ১৯৪৬ সালে আই এন এ

বন্দিদের মুক্তির দাবিতে যে গণআন্দোলন গড়ে ওঠে তাতেও হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায় যোগ দেয়। ১৯৪৬-র ঐতিহাসিক নৌ বিদ্রোহে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্তদের অবদান কেউ ভুলতে পারে?

১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগ নানা পর্বের মধ্য দিয়ে প্রাকস্বাধীনতা পর্বে এগিয়েছে। কিন্তু মুসলিম লিগ ব্রিটিশ ভারতে জন্মসূত্রে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত সব মানুষের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক রাজনীতির ভিত্তিতে ধর্মভিত্তিক ঔপনিবেশিক-উত্তর রাষ্ট্র গঠনের লক্ষ্যে মুসলিম লিগের ঘোষণা তার আত্মসংকটের অনিবার্য লক্ষণ।

ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার ঐক্যবদ্ধ জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে দুর্বল করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে চেয়েছিল সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের অপকৌশলকে। রাজনৈতিক প্রকল্প হিসেবে সাম্প্রদায়িক বিভাজন নীতির পরিকল্পিত রূপায়ণ শুরু হয় ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন পর্বেই। সে কারণেই হিন্দু মৌলবাদ এবং মুসলিম মৌলবাদ উভয়কেই ঔপনিবেশিক সরকার মদত দিয়েছে। অখিল ভারতীয় হিন্দু মহাসভা (প্রতিষ্ঠা ১৯১৫), রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (প্রতিষ্ঠা ১৯২৫) জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের অংশীদার ছিল না বলেই ঔপনিবেশিক শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছে লাগাতার।

সঙ্ঘ পরিবার সংগ্রামে অন্যরা যোগদান করেছিল কিনা সেই মন্তব্য করছে! স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘ পরিবারের অবদান কী? ব্রিটিশদের সন্তুষ্ট করে লাগাতার তারা স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরোধিতা করে গেছে। মন্টে-মির্লো সংস্কারের (১৯০৯)পর বিনায়ক দামোদর সাভারকার (১৮৮৩-১৯৬৬) বন্দি হন। তাঁকে আন্দামানের সেলুলার জেলে পাঠানো হয় ১৯১১ সালের জুলাই মাসে। আন্দামন জেলে পাঠানোর আট সপ্তাহের মধ্যে সাভারকার ব্রিটিশ সরকারের কাছে চিঠি লিখে মুক্তি প্রার্থনা করেন। ক্ষমা প্রার্থনা করে ব্রিটিশ সরকারের কাছে একাধিক চিঠি তিনি লিখেছিলেন আন্দামান থেকে। শেষ পর্যন্ত মুচলেকা দিয়েই সাভারকার মুক্তি পান। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি যুক্ত হন হিন্দুত্ববাদের প্রসারের কাজে।

জেল থেকে মুক্তির আগেই ১৯২৩ সালে 'জনৈক মারাঠি' ছদ্মনামে 'হিন্দুত্ব: হিন্দু কে?' শীর্ষক একটি পুস্তিকা লেখেন সাভারকার। সেই পুস্তিকাতেই সাভারকার প্রথম 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-র কথা তুলে ধরেন। ভারতে 'দ্বিজাতি তত্ত্ব'-র প্রথম প্রবক্তা মুসলিম লিগ নয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা হাত মিলিয়েছিল জিন্নার মুসলিম লিগের সঙ্গেও। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে ভাইসরয় লর্ড লিনলিথগো একতরফাভাবে ভারতকে দ্বিতীয় যুদ্ধের শরিকে পরিণত করলে প্রদেশে প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীরা পদত্যাগ করেন। সেই সময় সাভারকারের নেতৃত্বাধীন হিন্দু মহাসভা সিন্ধু প্রদেশ, নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রদেশ এবং বাংলায় মুসলিম লিগের সঙ্গে হাত মিলিয়ে সরকারে যোগ দেয়। ১৯৪৩ সালের মার্চে সিন্ধু প্রদেশের মন্ত্রিসভা 'পাকিস্তান'

গঠনের প্রশ্নে প্রাদেশিক আইনসভায় প্রস্তাব পাশ করায়। হিন্দু মহাসভার মন্ত্রীরা সেই মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। 'পাকিস্তান' প্রস্তাব সরকারিভাবে গ্রহণ করার পরও হিন্দু মহাসভার সদস্যরা লিগ মন্ত্রিসভায় থেকে যান।

সঙ্ঘ পরিবার স্বাধীনতার প্রাক-লগ্নেও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষের পরিবেশকে বিষিয়ে তুলতে তৎপর থেকেছে। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মোকাবিলা এবং সম্প্রীতির পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে উপমহাদেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ যখন তৎপর; তখনও হিন্দুত্ববাদীরা মদত জুগিয়েছে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে।

ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষণে হিন্দু-মুসলিম ঐক্যের জন্য দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিলেন গান্ধিজী। সঙ্ঘ পরিবারের তা একেবারেই পছন্দ ছিল না। সঙ্ঘ পরিবার-লালিত নাথুরাম গডসের ছোঁড়া বুলেট তাই প্রাণ কেড়ে নিল স্বয়ং গান্ধিজীর।

মৌলবাদী অপপ্রচার

'পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীরা মুসলিম তোষণ করে এসেছে।'

প্রকৃত সত্য

প্রথমত, 'মুসলিম তোষণ' কথাটা হিন্দুত্ববাদী মৌলবাদীরা বলে তাদের সংখ্যালঘুবিদ্বেষী বাগধারা থেকে। দ্বিতীয়ত, এদেশে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বঞ্চনার শিকার অন্যান্য পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়গুলির মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরাও।

বামপন্থীরা শ্রেণিগত ও সামাজিক শোষণ এবং বৈষম্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে। শোষণ ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনই তাঁদের লক্ষ্য। যে কোনো ধরনের সাম্প্রদায়িক মৌলবাদের বিরোধিতা করা এবং ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করা বামপন্থী রাজনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য। বামপন্থা এবং সাম্প্রদায়িকতা পরস্পরবিরোধী।

তবে সংখ্যালঘুরা যেখানে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ সেখানে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবস্থার উন্নয়নের জন্য বামপন্থীরা আন্তরিকভাবে সংগ্রাম করে। কারণ গণতন্ত্রের পূর্বশর্ত সংখ্যালঘু অধিকার রক্ষা করা।

বামফ্রন্ট সরকারও গণতান্ত্রিক নীতিকে মান্যতা দিয়ে ভাষাগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের উন্নয়নের প্রতি দায়বদ্ধ ছিল। পিছিয়ে পড়া সব নাগরিকের উন্নয়নের জন্য বিশেষ নজর দিয়ে সাধ্যমতো কাজ করাই ছিল বামফ্রন্ট সরকারের উন্নয়ন কর্মসূচির লক্ষ্য। পরিস্থিতির আমূল পরিবর্তন সাধন দেশের বিদ্যমান পরিস্থিতিতে একটি অঙ্গরাজ্যের রাজ্য সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু ভূমিসংস্কার, শিক্ষার বিস্তার, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ, গণতান্ত্রিক অধিকারের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সামাজিক ও সাম্প্রদায়িক বৈষম্যমুক্ত প্রশাসন, গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচির সাফল্য, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির বাস্তবায়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি – এসবের সুফল সাধারণভাবে রাজ্যের সব নাগরিক পেয়েছেন। স্বভাবতই পেয়েছেন সংখ্যালঘু অংশের মানুষও। সংখ্যালঘু অংশের মানুষের শিক্ষা, কর্মসংস্থান ও আর্থিক উন্নয়নের সুযোগ বৃদ্ধির জন্য বামফ্রন্ট সরকার সর্বদাই সচেষ্ট

ছিল। মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে বামফ্রন্ট সরকার উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকীকরণ করেছে। বিধিবদ্ধ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাধ্যমিকের সমতুল্য করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের বামফ্রন্ট সরকার বেতন ও পেনশনের আওতায় এনেছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার ক্ষেত্রেও বামফ্রন্ট সরকারের আন্তরিক ভূমিকা সকলেই জানেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত রাজ্যের এক চতুর্থাংশেরও বেশি মানুষ পিছিয়ে থাকলে রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। সামগ্রিক উন্নয়ন হলে সবার স্বার্থ রক্ষা পায়। রঙ্গনাথন কমিটির সুপারিশ প্রকাশের পর বামফ্রন্ট সরকার সংখ্যালঘু দরিদ্র মানুষের স্বার্থে সরকারি চাকরিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উন্নয়নে এই সমস্ত পদক্ষেপকে 'তোষণ' বলতে পারে একমাত্র সাম্প্রদায়িক শক্তিই। বামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশ্নে কোনো সমঝোতা করে না। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা বা সংখ্যালঘু সাম্প্রদায়িকতা উভয় ধরনের বিপদের বিরুদ্ধেই লাগাতার লড়াই চালাতে হবে। তাদের পরাস্ত করতে হবে।

তবে আমাদের মতো দেশে সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা বড় বিপদের কারণ। সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িকতা ক্রমশ ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করতে পারে।

মৌলবাদী অপপ্রচার

'মমতা ব্যানার্জির সরকার মুসলিমদের স্বার্থে কাজ করছে।'

প্রকৃত সত্য

তৃণমূল কংগ্রেস সরকার জন্মকাল থেকেই সাম্প্রদায়িক শক্তির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলেছে। তা সে সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু যে ধরনের মৌলবাদ হোক। এব্যাপারে তৃণমূলের কোনো নীতিগত অবস্থান নেই। সঙ্ঘ পরিবার এবং তৃণমূল কংগ্রেস হিসেব কষেই পরস্পরের পৃষ্ঠপোষকতা করছে।

রাজ্যে ক্ষমতায় বসার পর সংখ্যালঘু উন্নয়নে কোনো প্রতিশ্রুতিই পালন করেনি তৃণমূল সরকার। ক্ষমতায় এসে সংখ্যালঘু মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থানের জন্য প্রকৃত কোনো কাজই তারা করেনি। তৃণমূল কংগ্রেস ২০১১-র নির্বাচনী ইশ্‌তেহারে বলেছিল, ক্ষমতায় এলে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য 'উন্নত' ও 'বিশেষ' বেতন কাঠামো করবে। ক্ষমতায় বসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি বলেছিলেন তাঁর সরকার রাজ্যে দশ হাজার মাদ্রাসা খুলবে। একটিও হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা ছিল, সংখ্যালঘুদের জন্য রাজ্যে ৫৬টি মার্কেটিং হাব তৈরি হবে এবং সেগুলিতে নাকি প্রায় ছাপান্ন হাজার সংখ্যালঘু ছাত্রদের কাজের বন্দোবস্ত হবে। প্রতিশ্রুতিগুলির একটিও পূরণ হয়নি। বরং ২০০৫-০৬ সালে চালু 'স্টেট গভর্নমেন্ট স্টাইপেন্ড' প্রকল্পটি তৃণমূল সরকার ২০১১-১২-তে তুলে দিয়েছে। উচ্চমাধ্যমিক থেকে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়াশোনা করা সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঐ প্রকল্পে ভাতা দেওয়া হতো। গরিব সংখ্যালঘু পরিবারের মহিলাদের স্বনির্ভরতার

প্রকল্প (এম ডব্লিউ ই পি) রাজ্যে মুখ থুবড়ে পড়েছে তৃণমূল আমলে। চাকরির নিরাপত্তার দাবিতে এখন মাদ্রাসার শিক্ষকরা কলকাতায় ফুটপাতে অনশন করলেও রাজ্য সরকার ফিরে তাকাচ্ছে না।

তৃণমূল সরকারের আমলে সংখ্যালঘু উন্নয়নে 'মাল্টি সেক্টরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (এম এস ডি পি) খাতে পশ্চিমবঙ্গের হাল শোচনীয়। বামফ্রন্টের আমলে এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ ছিল দেশের মধ্যে প্রথম। পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমে এখন প্রয়োজনীয় কাজ হচ্ছে না। অথচ, বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নিগম একটানা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে স্বীকৃতি পেয়েছে দেশের মধ্যে সেরা কাজের জন্য।

দরিদ্র সংখ্যালঘুদের 'ও বি সি' হিসাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণের সময় বিরোধী দল হিসেবে তৃণমূল বাধা দিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেস বহু বছর কেন্দ্রে সরকারি ক্ষমতা ভোগ করেছে, মমতা ব্যানার্জি কেন্দ্রে বহু বছর মন্ত্রী থেকেছেন, কিন্তু সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারি চাকরিতে পদ সংরক্ষণের কথা ভুলেও কখনও মুখে আনেননি।

বামফ্রন্ট সরকার গরিব সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষণের সেই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত কার্যকর করার সময় রাজ্য সরকারি চাকরিতে ও বি সি-দের জন্য সংরক্ষণ ৭ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ১৭ শতাংশে উন্নীত করে। ও বি সি তালিকাকে দুটি ভাগে ভাগ করে ৭% পদ সংরক্ষিত করা হয় 'অনগ্রসর' অংশের জন্য এবং ১০% পদ সংরক্ষিত করা হয় 'অধিক অনগ্রসর'-দের জন্য। 'অধিক অনগ্রসর'-দের তালিকায় ৫৬টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৪৯টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে এবং 'অনগ্রসর'-দের তালিকায় ৫২টি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ৬টি মুসলিম জনগোষ্ঠীকে অন্তর্ভুক্ত করেছিল বামফ্রন্ট সরকার। ফলে ১০ শতাংশ সংরক্ষণের সুযোগের আওতায় সিংহভাগ ছিলেন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলি।

তৃণমূল আমলে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীগুলির সিংহভাগকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে 'অনগ্রসর'-দের তালিকায়; যেখানে সংরক্ষণ তুলনায় কম।

আসলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রকৃত আর্থসামাজিক উন্নয়নে কার্যকর কোনো উদ্যোগে আগ্রহ দেখায়নি তৃণমূল সরকার। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। শুধু আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিষয় নয়, সংখ্যালঘুদের মধ্যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত পরিচিতিসত্তায় উসকানি দিয়ে ভোটের ফায়দা লুটতে সব কিছুই করেছে তৃণমূল। সংখ্যালঘু ভাবাবেগকে তৃণমূল কাজে লাগাতে চেয়েছে। রাজনৈতিক স্তরে বিতর্কের মূল অভিমুখ সামাজিক অর্থনৈতিক সংক্রান্ত বিষয় থেকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে কেন্দ্রীভূত করতে চেয়েছে সংকীর্ণ গোষ্ঠীগত ভাবাবেগ-নির্ভর পরিসরে। এভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে প্রতিক্রিয়াশীল বামবিরোধী রাজনীতিকে রূপ দিতে চেয়েছে।

●

স্বভাবতই, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ-পরিচালিত ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য মিত্রকে খুঁজে পেয়েছিল তৃণমূল কংগ্রেস তার প্রতিষ্ঠাপর্ব থেকেই। তৃণমূল

কংগ্রেসের জন্ম কংগ্রেসের ঔরসে। কিন্তু, জন্মলগ্ন থেকেই তৃণমূল যাত্রা শুরু করেছিল বি জে পি-র হাত ধরে। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসই নির্বাচন কমিশনে নিবন্ধিকৃত প্রথম এবং একমাত্র রাজনৈতিক দল যারা পশ্চিমবঙ্গে বামপন্থীদের বিরোধিতায় বি জে পি-র সঙ্গে সরাসরি হাত মেলায়। ক্ষমতার লোভে রাজ্যে খাল কেটে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার কুমির ঢুকিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেসই। দীর্ঘদিন দুই পক্ষ মিলেমিশে কেন্দ্রে সরকার চালিয়েছে। রাজ্যে পঞ্চায়েত চালিয়েছে। পুরসভা চালিয়েছে। কলকাতা কর্পোরেশন চালিয়েছে। ঘোষিতভাবেই তৃণমূল কংগ্রেস এবং বি জে পি পরস্পরের স্বাভাবিক মিত্র।

'কমিউনিস্টদের' হটাতে রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সঙ্ঘ (আর এস এস)-র সাহায্য চেয়েছিলেন মমতা ব্যানার্জি। ২০০১-র ১৫ই সেপ্টেম্বর নয়াদিল্লিতে আর এস এস-র একটি জাতীয় পর্যায়ের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হন তৃণমূল নেত্রী। সেদিন ওই সভায় তৃণমূল নেত্রী বলেছিলেন: ''যদি আপনারা (আর এস এস) এক শতাংশ সাহায্য করেন, আমরা কমিউনিস্টদের সরাতে পারবো।'' তিনি আরও বলেছিলেন,''আপনারা সত্যিকারের দেশপ্রেমিক। আমি জানি আপনারা দেশকে ভালোবাসেন...''। মমতা ব্যানার্জি আর এস এস-র নেতাদের সেদিন আশ্বস্ত করেছিলেন এই বলে যে, ''কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আপনাদের লড়াইয়ে আমরা সঙ্গে আছি।''

কমিউনিস্টবিরোধী একটি বই প্রকাশ উপলক্ষে সেদিন আর এস এস-র সভায় উপস্থিত ছিলেনত এইচ ভি শেষাদ্রি, মোহন ভাগবতের মতো কট্টর হিন্দুত্ববাদীরা। তৃণমূল নেত্রীর সেদিনের বক্তব্যে আর এস এস খুবই উৎসাহিত হয়। তাই বি জে পি-র রাজ্যসভার সাংসদ বলবীর পুনী ওই সভাতেই বলেন, ''আমাদের প্রিয় মমতাদিদি সাক্ষাৎ দুর্গা।'' সেই 'দুর্গা'-র দলীয় কর্মীদের বেপরোয়া নৈরাজ্যকেই এখন রাজ্যে হাতিয়ার করেছে আর এস এস।

২০১১ সালের ১৩ই মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশিত হয়। ১৪ই মে আনন্দবাজার পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত হয় মমতা ব্যানার্জির প্রতি গুজরাটের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আশীর্বাণী ও পরামর্শ–''প্রথম রাতেই বিড়াল মেরে দিন''। মোদীর উচ্ছ্বসিত পরামর্শ: ''আদরণীয় মমতাবেন, প্রথমেই আপনাকে আমার অভিনন্দন। আপনার কাছে আমার গগনচুম্বী প্রত্যাশা।...আপনি একজন দৃঢ়চেতা মুখ্যমন্ত্রী, আপনার বুদ্ধিমত্তা(র)...ওপর আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। কিন্তু প্রশাসনে কঠোরতা খুব আবশ্যক। এই কঠোরতা শুরুতেই আপনার কাছ থেকে প্রত্যাশা করি।'' এই পরামর্শের ধারাতেই চলছে তৃণমূল।

২০১৪ সালের ৩০শে জানুয়ারি কলকাতায় ব্রিগেড ময়দানে বি জে পি-র নির্বাচনী প্রচার সভায় নরেন্দ্র মোদী পেশ করেন তৃণমূলের সঙ্গে রাজনৈতিক সহাবস্থানের মোক্ষম যুক্তি: "বাংলায় পরিবর্তনের সরকার এনেছেন আপনারা।... দিল্লিতে মোদীর সরকার আনুন। তারাও উন্নয়নের কাজ করবে।... আপনাদের দু'হাতেই লাড্ডু থাকবে!"

মমতা ব্যানার্জি সম্পর্কে বি জে পি-র উচ্ছ্বাসের আসল কারণটাও বেরিয়ে আসে ২০১৪ সালের ১২ জুন খোদ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদীর ভাষণে– "৩৫ বছরের বাম

অপশাসন থেকে রাজ্যকে বার করে আনতে কী পরিশ্রমই না করেছেন মমতাজি!"

কীভাবে সঙ্ঘ পরিবার বিগত নির্বাচনগুলিতে তৃণমূল কংগ্রেসকে সাহায্য করেছে তাও এখন স্পষ্ট। ২০১১-র বিধানসভা নির্বাচনে সঙ্ঘ পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষেই প্রচার করেছিল। নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর উচ্ছ্বসিত আর এস এস তাদের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে লেখে, ''অবশেষে দুঃশাসনের অবসান। গত ৩৪ বৎসর ধরিয়া বাংলার বুকের উপর ফ্যাসিবাদী দলতন্ত্রের যে জগদ্দল পাথর চাপিয়া বসিয়াছিল, রাজ্যের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সেই পাথরকে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে।...ইহা স্বীকার করিতেই হইবে, পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদী সরকার ও ক্যাডারদের অত্যাচারের প্রতিবাদে দায়িত্বশীল ভূমিকায় অবতীর্ণ হন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁহারই নেতৃত্বে তৃণমূল জোটের এই বিরাট জয়।'' ('স্বস্তিকা', ২৩শে মে ২০১১)

সেই 'দায়িত্বশীল' মমতা ব্যানার্জির সরকার নরেন্দ্র মোদীর কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়ক হবে। আর এস এস সেই বিষয়ে নিঃসন্দিগ্ধ। আর এস এস তাদের মুখপত্রের সম্পাদকীয়তে তা প্রকাশও করেছে। 'কংগ্রেস মুক্ত ভারতের লক্ষ্যে বিজেপি' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে –''একইসঙ্গে এ আই ডি এম কে এবং তৃণমূল কংগ্রেসের জয় কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যপরিচালনার ক্ষেত্রেও কিছুটা সহায়ক হইবে।...তৃণমূল নেত্রী 'মানুষের স্বার্থে' কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে ইস্যুভিত্তিক সহযোগিতার কথা বলিয়াছেন। রাজ্যসভায় জি এস টি বিল পাশ করাইবার ক্ষেত্রে যাহা সহায়ক হইবে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সুসম্পর্কও একইভাবে রাজ্যসভায় প্রতিফলিত হইতে পারে। অর্থাৎ, এককথায় 'অ্যাডভান্টেজ বিজেপি।'' ('স্বস্তিকা', ৩০শে মে ২০১৬)

সঙ্ঘ পরিবার পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল জমানায় খুব খুশি। আর এস এস-র শাখা বাড়ছে হই হই করে। তৃণমূল সরকারের বদান্যতায় রাজ্যের সর্বত্র স্কুল চালানোর ঢালাও অনুমোদন পেয়েছে আর এস এস। সাধারণ মিছিলের অনুমতি পেতে বামপন্থীদের হিমশিম খেতে হয়। প্রকাশ্য রাস্তায় মিছিলে হাঁটার সময় বিরোধী নেতা আক্রান্ত হন পুলিশের সামনে। অথচ সঙ্ঘ পরিবারের কর্মসূচি সফল করতে তৃণমূল সরকারের সহৃদয়তার শেষ নেই। লম্বা লম্বা খোলা তলোয়ার হাতে সঙ্ঘ পরিবার ও বি জে পি-র নেতারা মিছিল করলেন। পুলিস অফিসাররা সেই সব সশস্ত্র মিছিল সযত্নে তদারকি করলেন। রাজ্যের সর্বত্র তৃণমূলের মন্ত্রী, পুরপ্রধান, পঞ্চায়েত প্রধান, বিধায়ক, সাংসদ, নেতা ও কর্মীরা ঢালাও সেই সব সশস্ত্র মিছিলে যোগ দিলেন। সঙ্ঘ পরিবার ও বি জে পি নেতাদের সঙ্গে পাশাপাশি পথ হাঁটলেন শাসক তৃণমূলের বহু নেতা-কর্মী। তৃণমূল কংগ্রেস এবং সঙ্ঘ পরিবারের বোঝাপড়া শুধু গোপনে নয়, প্রকাশ্যেও। কয়েকদিন আগে তৃণমূল নেত্রী তিনজন বি জে পি নেতার নাম আগামী রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে তাঁর পছন্দের প্রার্থী হিসেবে প্রস্তাব করেছেন।

ইতিপূর্বে মোদী সরকারের বেশ কয়েকটি জনবিরোধী বিল (যেমন,বীমা আইন সংশোধনী বিল, কয়লা এবং খনি ও খনিজ সম্পদ বিল ইত্যাদি) পাশ করতে সংসদে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করেছে তৃণমূল। শুধু বি জে পি নয়, ২০১৫ সালের ২৩শে জুন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ৬৩তম মৃত্যুদিবস সরকারিভাবে পালন করে তৃণমূল সরকারও।

অন্যদিকে মোদী সরকারও তৃণমূলের দুর্নীতি নিয়ে নীরব। সারদা, নারদের তদন্ত বেশির ভাগ সময়ই থমকে থাকে। সরকারি প্রকল্পগুলি রূপায়ণে ব্যাপক দুর্নীতি সত্ত্বেও তৃণমূল রাজ্য সরকারকে হাজার হাজার কোটি টাকা দিয়েই চলেছে মোদী সরকার। কেন্দ্রের বি জে পি মন্ত্রীরা পশ্চিমবঙ্গে এলেই মুখর হয়ে উঠেন তৃণমূল নেত্রীর প্রশংসায়।

পারস্পরিক স্বার্থপূরণে একদিকে তৃণমূল কংগ্রেস উভয় মৌলবাদী শক্তির সঙ্গেই রফা করে চলেছে, অন্যদিকে সঙ্ঘ পরিবার সংখ্যাগুরু সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উসকানি দিয়ে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও মেরুকরণ বাড়িয়ে চলেছে।

এই প্রেক্ষাপটে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষায় তৃণমূল সরকারের ভূমিকার কথা কেন বলছে সঙ্ঘ পরিবার? উদ্দেশ্য কি যথেষ্ট স্পষ্ট নয়!

মৌলবাদী অপপ্রচার
‘মাদ্রাসাগুলিতে শুধুই জেহাদের শিক্ষা দেওয়া হয়।’

প্রকৃত সত্য

পশ্চিমবঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা প্রভূত ভুল ধারণা রয়েছে। সাধারণভাবে সব ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থাকেই মাদ্রাসাশিক্ষা হিসেবে মনে করার একটা ভুল প্রবণতা রয়েছে। ব্রিটিশ ভারতে সরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থার সূত্রপাত মাদ্রাসার হাত ধরে। হিন্দু স্কুল প্রতিষ্ঠার সাড়ে তিন দশকেরও আগে ওয়ারেন হেস্টিংস বড়লাট থাকাকালীন ১৭৮০ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ‘কলকাতা মাদ্রাসা’। ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতে রাষ্ট্রীয়-ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সর্বপ্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বেঙ্গল প্রেসিডেন্সি সরকার ‘কলকাতা মাদ্রাসা’ পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। ১৮২৭ সালে ওয়েলেসলি স্কোয়ারে ‘কলকাতা মাদ্রাসা’ ভবনকে স্থানান্তরিত করা হয়।

কলকাতা মাদ্রাসা স্থাপনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ফারসি ও আরবি ভাষায় এবং মুসলিম আইন (ফিকাহ্) শাস্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তি তৈরি করা, যাদেরকে সরকারি অফিসে ও বিচারালয়ে নিম্নপদে নিয়োগ করা যাবে। বিশেষত মুসলিম আইনের ব্যাখ্যাকারী হিসেবে তারা কাজ করতে পারবেন।

১৯১৫ সালে মাদ্রাসা শিক্ষায় নতুন ব্যবস্থা চালু করা হয়। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় সেন্ট্রাল মাদ্রাসা একজামিনেশন বোর্ড ফর সিনিয়র মাদ্রাসা। ১৯৫০ সালে তা নামবদলে হয় পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। ১৯৯৪ সালে বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে পূর্ণ মর্যাদা দিয়ে একটি স্বশাসিত সংস্থা হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড গঠন করে।

বামফ্রন্ট সরকার মাদ্রাসা শিক্ষার বিকাশে এবং আধুনিকীকরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। মাদ্রাসা শিক্ষাকে মাধ্যমিকের সমতুল্য করেছে। মাদ্রাসা সার্ভিস কমিশন তৈরি করেছে। মাদ্রাসার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সরকারি তহবিল থেকে বেতন ও পেনশন দেবার ব্যবস্থা করেছে।

আগে মাদ্রাসায় ফাজিল বা উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সুযোগ ছিল না। বেশ কয়েকটি মাদ্রাসায় ফাজিল বা উচ্চমাধ্যমিক পড়ার সুযোগ প্রসারিত করা হয়। সিনিয়র মাদ্রাসাগুলিতে প্রথম থেকে দশম বা দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে এখানে আধুনিক শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা রয়েছে। মাতৃভাষা ছাড়াও পড়ানো হয় ইংরেজি, আরবি, গণিত, বিজ্ঞান, ভূগোল, ইতিহাস, থিওলজি এবং ইসলামিক সংস্কৃতি।

২০১০ সালে বামফ্রন্ট সরকার বিধানসভায় আইন পাশ করে কলকাতা মাদ্রাসাকে 'আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়'-এ পরিণত করে। উল্লেখ্য, বিরোধী তৃণমূল তখন এই উদ্যোগের বিরোধিতা করেছিল।

সরকারি ও সরকার স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসাগুলির পাঠক্রম পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত। সেখানে পাঠক্রম বহির্ভূত অন্য কিছু পড়ানোর সুযোগ নেই। মাদ্রাসার শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে একটা অংশ এমনকি হিন্দুসহ অন্যান্য সম্প্রদায় থেকেও এসেছেন।

তবে সরকার স্বীকৃত প্রাতিষ্ঠানিক মাদ্রাসা ব্যবস্থা বহির্ভূত তথাকথিত 'খারিজি মাদ্রাসা'গুলির একাংশকে বিভিন্ন মৌলবাদী সংগঠন ব্যবহারের চেষ্টা করছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান শাসকদলের অনেকের প্রশ্রয়ও রয়েছে এসব কাজে। কিন্তু 'মাদ্রাসা' এবং 'খারিজি মাদ্রাসা'কে একইভাবে বিচার করা যায় না।

তাছাড়া, কোনো 'খারিজি মাদ্রাসা'-য় আরবী পাঠের চর্চা হচ্ছে মানেই সেখানে 'জেহাদ'-র শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে এমন ধরে নেওয়া যায় না।